# সাধক
# রামপ্রসাদ

জ্যোতিপ্রকাশ সেনগুপ্ত

পরিবেশক :
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রকাশক

এন. তালুকদার

বিরাটি

২৪ পরগণা

পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৭

মুদ্রাকর

শ্রীমনোরঞ্জন নায়ক

শংকর প্রেস

৩৭।১।১ শিবনারায়ণ দাস লেন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতৃব্য

মণীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের

শ্রীচরণে—

শ্রীভগীরথ

রচিত

# শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা

মহান্ সাধকের মহৎ জীবন-কাহিনী পড়ুন। গল্প-উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য।

মূল্য: চার টাকা

## নিবেদন

অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশ অন্ধকারে ঘনীভূত। সেই অন্ধকারের দীপশিখা রূপে আবির্ভূত হন সাধক কবি রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের রচনা শিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠক সমাজের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন গ্রাম্য সমাজে আজও আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

রামপ্রসাদ নিজেই বলিয়াছেন "লাখ উকিল করেছি খাড়া" অর্থাৎ তিনি লক্ষ গান রচনা করিয়াছেন। সেই গান আজও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত এবং সেই গান ও সুরের আকর্ষণে আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক ধরা না পড়িয়া পারেন নাই। রামপ্রসাদের রচনাবলীর পদাবলী বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

রামপ্রসাদ জীবন ও কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি লইয়া কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও দয়াল ঘোষ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কালের বহু অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত নানা আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

এই পুস্তকে সাধক রামপ্রসাদের জীবনের যথাযথ ঘটনা লইয়া একটি জীবনী রচনার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। তবে প্রথমে অর্থাৎ 'প্রাক্ কথনে' অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ লইয়া একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরে তাঁহার জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা ও সাহিত্য ধর্ম লইয়া যথাসম্ভব আলোচনা করি এবং পরিশেষে সাধক কবির রচনাবলীর কিছু কিছু অংশ এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিলাম।

যাঁহারা পুস্তক প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীভগীরথ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কানাইলাল

চক্রবর্তী, বন্ধুবর দিলীপ মৌলিক ও রতন ঘোষের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। বিভিন্ন পুস্তক জোগাড় করিয়া দিয়া যাঁহারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন সেই ভগ্নীসম দুলালী ঘোষ, কৃষ্ণা দাশগুপ্তা ও শ্রীমান পঙ্কু ( প্রদীপ বিশ্বাস ) ও শরৎ সংঘের সভ্য-সভ্যাগণের কথা না উল্লেখ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে পূর্বসূরীগণ নানা বিষয়ে নানাভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সৃষ্টির সুযোগ ও সুবিধা আমি লইয়াছি, তাহা অকপটে আনন্দে ও সাগ্রহে স্বীকার করিলাম।

—জ্যোতিপ্রকাশ সেনগুপ্ত

# প্রাক-কথন

আশাহীন, আনন্দহীন, আশ্বাসহীন, অবিরাম অত্যাচারের অষ্টাদশ শতকের মানুষ যখন মৃতপ্রায় সেই সময় "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত"— ওঠো, জাগো'র বাণী শুনাইতে, প্রাণে আশার আলো জাগ্রত করিবার জন্য সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন অধুনা ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী থানার অধীনে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে কুমারহট্ট বা কুমারহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্ট বা কুমারহাটির অপর নাম হালিশহর।

ঠাকুরপাড়া ও চড়কডাঙার মধ্যবর্তী স্থানে রামপ্রসাদের পৈতৃক ভিটা। সেই সময়ে এই হালিশহর বা কুমারহট্ট যে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল তাহার বহু প্রমাণ আজও বিদ্যমান।

কুমারহট্ট বা কুমারহাটি নামকরণ সম্বন্ধে প্রচুর জনশ্রুতি আজও প্রচলিত আছে। তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না।

অতীতে কুমারহট্টের পণ্ডিত সমাজের প্রচুর খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়া শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।

কথিত আছে, একদা শাস্ত্র বিচার করিবার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কুমারহট্টে আসিয়া উপস্থিত হন। কুমারহট্টের পণ্ডিতগণ তর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা স্থানীয় একজন সুচতুর কুম্ভকারকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া এবং স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পরিচর্যার জন্য পাঠাইয়া দেন এবং সেই স্ত্রীবেশী কুম্ভকারটি একটি বালককে পুত্ররূপে সেই স্থানে লইয়া যান।

একদিন প্রাতে স্ত্রীবেশী পরিচারিকা গৃহস্থালী কর্মে নিযুক্ত। পণ্ডিতগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছেন। সেই সময় কতকগুলি কাক চারিদিকে "কা কা" ধ্বনি করাতে, ছেলেটি পূর্ব শিক্ষামত স্ত্রীবেশী কুম্ভকার মাতার নিকট গিয়া কাক কেন সকালে "কা কা" ধ্বনি করে তাহা জানিবার জন্য বায়না ধরিল।

ছেলের বায়না থামাইবার জন্য মাতা তাঁহাকে পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া প্রশ্ন করিতে বলিল, তখন ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতদের নিকট গিয়া প্রশ্ন করিল। পণ্ডিতগণ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "ঐরূপ কলরব করা কাকজাতির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম, তাই করিতেছে।"

এই উত্তর শুনিয়া বালকটি পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বেশধারী মাতার নিকট আসিয়া বলিল যে, পণ্ডিতগণ কিছুই জানে না। "মা, তুই বল, কাক কেন এত ডাকিতেছে।"

ছেলেকে শান্ত করিবার জন্য বেশধারী স্ত্রী কুম্ভকারটি বলিল, "আমি আমাদের এখানকার পণ্ডিতদিগের নিকট কাকের ডাকিবার এইরূপ কারণ শুনিয়াছি, শোন —

"তিমিরারিস্তমোহন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ।
'বয়ং কাকা বয়ং কাকা' ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ॥"

অর্থাৎ, সূর্যদেব অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চতুর্দিক আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া কাককুলের মনে ভয় হইয়াছে যে, তাহাদিগের অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণকে অন্ধকার বিবেচনায় পাছে সূর্যদেব তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন, সেই ভয়ে কাককুল 'বয়ং কাকা, বয়ং কাকা', অর্থাৎ আমরা কাক, আমরা কাক বলিয়া চিৎকার করিয়া প্রাণভয়ে সূর্যদেবকে আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ স্ত্রীবেশী পরিচারককে এমন শুদ্ধস্বরে সংস্কৃত শ্লোকের উচ্চারণ ও তাহার এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ঐ সংস্কৃত শ্লোক কোথা হইতে শিখিয়াছে।

স্ত্রীবেশ। কুম্ভকার বলিল, "শিখিব আর কোথায় বাবাঠাকুর। বাড়ির নিকট পণ্ডিতের টোল-চৌবাড়ী আছে, সেখানে পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে পড়াইবার কালে যে সকল শ্লোক বলেন, তাই শুনিয়াই আমাদের শেখা।"

"যে গ্রামে কুম্ভকারজাতীয়া নারী এমন সংস্কৃত জানে, না জানি সেখানকার পণ্ডিতগণের বিদ্যা কত অধিক" এই কথা চিন্তা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ 'তর্ক-যুদ্ধে'র আশা জলাঞ্জলি দিয়া "য পলায়তি স জীবতি" নীতি গ্রহণ করিলেন। একজন নিম্নশ্রেণীর কুম্ভকারের নিকট নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের এইরূপ পরাজয় হওয়ায়, হালিশহরের পণ্ডিতগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রামের নাম কুমারহট্ট, বা কুমারহাটি দিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি বহুকাল হালিশহরবাসীদের মুখে শোনা যাইত। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

কথিত আছে, যশোহর রাজবংশীয়েরা এই গ্রামে যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে আসিতেন। এইজন্য যশোহর হইতে এই গ্রাম পর্যন্ত "জাঙ্গাল" নামে একটি প্রশস্ত রাজপথ ছিল। আজও স্থানে স্থানে এই "জাঙ্গালের" ভগ্নাংশের চিহ্ন বিদ্যমান। মহারাজ প্রত্যপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে স্নান উপলক্ষে বহু লোকজন সমভিব্যাহারে ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর আসিতেন। তাঁহার ঐ আগমন সময়ে কিছুদিন ধরিয়া তথায় একটি হাট বসিত। ক্রমে সেই হাট স্থায়ী হয় এবং ঐস্থান তদনুসারে কুমারহট্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে।

আবার অনেকের ধারণা, ঐ গ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস হেতু উহা কুমারহট্ট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি উচ্চজাতীয় লোকের বাস ছিল। তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান।

রামপ্রসাদের জীবনীকারগণের মধ্যে কেহ বা তাঁহার বাসস্থান

"হালিশহরের অন্তঃপাতি কামারহট্ট বা কুমারহাটি" কেহ বা "হালিশহর মহকুমার অন্তবর্তী কুমারহট্ট", আবার কেহ বা "হালিশহর গ্রামের কুমারহট্ট পল্লী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কুমারহট্ট ও হালিশহর এক ও অভিন্ন গ্রাম। এই দুইটি নামেরই কিছু কিছু ইতিহাস আছে, তাহা পূর্বের আলোচনা হইতে জানিতে পারিয়াছি।

সে যাহাই হোক, এই গ্রামের "হালিশহর", "কুমারহট্ট" বা "কুমারহাটি" উভয় নামই যে প্রাচীন তাহার বহু প্রমাণ আজও বিদ্যমান। তাহার দুই একটি এস্থলে বিবৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আশা করি।

চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই গ্রামে বাস করিতেন। মহাপ্রভু একবার হালিশহরে গুরুর সেই বাসভূমি দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বোলে কুমারহট্টের নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার ॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে ॥

ঈশ্বরপুরীর বাসভূমি যে স্থানে মহাপ্রভু সেই স্থানের মৃত্তিকা তুলিতেছিলেন, তাঁহার শিষ্য ও বহু সঙ্গীগণও তাঁহার দেখাদেখি সে স্থান হইতে ঐরূপে মৃত্তিকা তুলিতে শুরু করেন, সেই মৃত্তিকা তোলার জন্য সেই স্থানটি একটি খাদে পরিণত হয়। ঐ খাদ অদ্যাপি "চৈতন্য-ডাবা" নামে তীর্থস্থানরূপে বিদ্যমান আছে। হালিশহরের অধিবাসীরা বলেন যে, ঐ ডোবার জল অত্যন্ত সুস্বাদু এবং কখনও শুষ্ক হয় না।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে' ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রাকালে ভাগীরথীর উভয় কূলে যে সকল গ্রাম

বিদ্যমান ছিল, তাহার বর্ণনা উপলক্ষে হালিশহর ও ত্রিবেণীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু'কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ॥

এই হালিশহরের পূর্বের নাম ছিল "হাবেলীশহর"। পুরাতন দলিল দস্তাবেজে, পরগণা ও গ্রাম উভয়ই "হাবেলীশহর" বলিয়া উল্লিখিত হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দলিলেও পরগণে "হাবেলী শহর" উল্লেখ আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে যে জমি দিয়াছিলেন তাহার দলিলেও "হাবেলী শহর" উল্লেখ আছে।*

রামপ্রসাদ নিজেও তাঁহার জন্মভূমির বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

"ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ স্থান।

এতক্ষণের আলোচনা হইতে স্পষ্ট অবগত হইতে পারি যে, কুমারহট্ট বা হালিশহর এককালে খুবই সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল কুমারহট্ট বা হালিশহর। শান্ত-স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেইস্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আসিতেম। ইহার পর হালিশহর বা কুমারহট্টের অধিক আলোচনার আর প্রয়োজন নাই।

কিছু জানিতে হইলে তাহার পূর্বাপর সকল ঘটনা জানার দরকার। সেই রকম সাধক কবি রামপ্রসাদকে জানিতে হইলেও অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমাদের ধারণা। অষ্টাদশ শতক বাংলাদেশের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই সময় বাংলাদেশে একদিকে নবাবী আমলের

---

*ভিতরে সনদটি নকল দেওয়া হইল।

সন্ধ্যা ঘনায়মান, অন্যদিকে সুচতুর ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য সম্ভারের সাথে স্বার্থসিদ্ধির কৌশল বিস্তার। দস্যুতস্করের উপদ্রব, বর্গী ও পর্তুগীজদের অত্যাচার আর রাজা-জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের উৎপীড়ন বাংলাদেশকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছিল।

সেই সময় সাধারণ মানুষ তাহাদের দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। অভাবের তাড়নায় সেই সময় সাধারণ মানুষ নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এমন কি নিজেকেও নাম মাত্র দক্ষিণায় প্রকাশ্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত।

সেই সময় দেশের শাসন বলিতে কিছুই ছিল না। তাহার কারণ, যাঁহারা দেশের সাধারণ প্রজার রক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই প্রাণভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিদর্শন বর্তমান। যে দেশের রাজা বা জমিদার নিজ ধনপ্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্থান ত্যাগ করেন সেই দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। এই অত্যাচারে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা একটি গ্রাম্য ছড়ার সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যাইবে—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

উপরের ছড়াটি হইতেই সেই সময়কার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্রটি সম্পূর্ণ বোঝা যায়, তাহার আর অধিক পরিচয় দিবার কিছু নাই। সেই সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক চিত্র আরো করুণ।

বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, আত্মকলহ ও বিলাসে তখন দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন। সেই সুযোগে ধূর্ত ইংরেজ বণিক "মানদণ্ড"কে "রাজদণ্ডে" পরিণত করিবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইসকল নানা ঘটনার সাহায্যে সামাজিক অবস্থার স্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে রামপ্রসাদ বাংলাদেশের জলবায়ুর মধ্যে লালিত-পালিত হন। তাই তাঁহার সংগীতের মধ্যেও তৎকালীন দেশের ও সমাজের নানা সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" ও রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর"এর বর্ণনা একত্রিত করিলে তাঁহার বংশ-পরিচয় এইরূপ দাঁড়ায় ঃ—

রাজশ্রীহর্ষ সেন ( খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী )
|
বিমল সেন
|
বিনায়ক সেন
|
রোষ সেন
|
নারায়ণ সেন
|
সাণ্ডু সেন
|
সরণি সেন
|
কৃত্তিবাস সেন
|
রত্নাকর সেন
|
নিত্যানন্দ সেন
|
জগন্নাথ সেন
|
যদুনন্দন সেন
|
রঞ্জন সেন
|
জয়কৃষ্ণ সেন
|
রামেশ্বর সেন
|
রামরাম সেন
|
নিধিরাম ( বৈমাত্রেয় ) — অম্বিকা — ভবানী — সাধক কবি রামপ্রসাদ — বিশ্বনাথ

সাধক কবি রামপ্রসাদ
|
(জ্যেষ্ঠা কন্যা) পরমেশ্বরী — রামদুলাল — রামমোহন — জগদীশ্বরী (কন্যা)
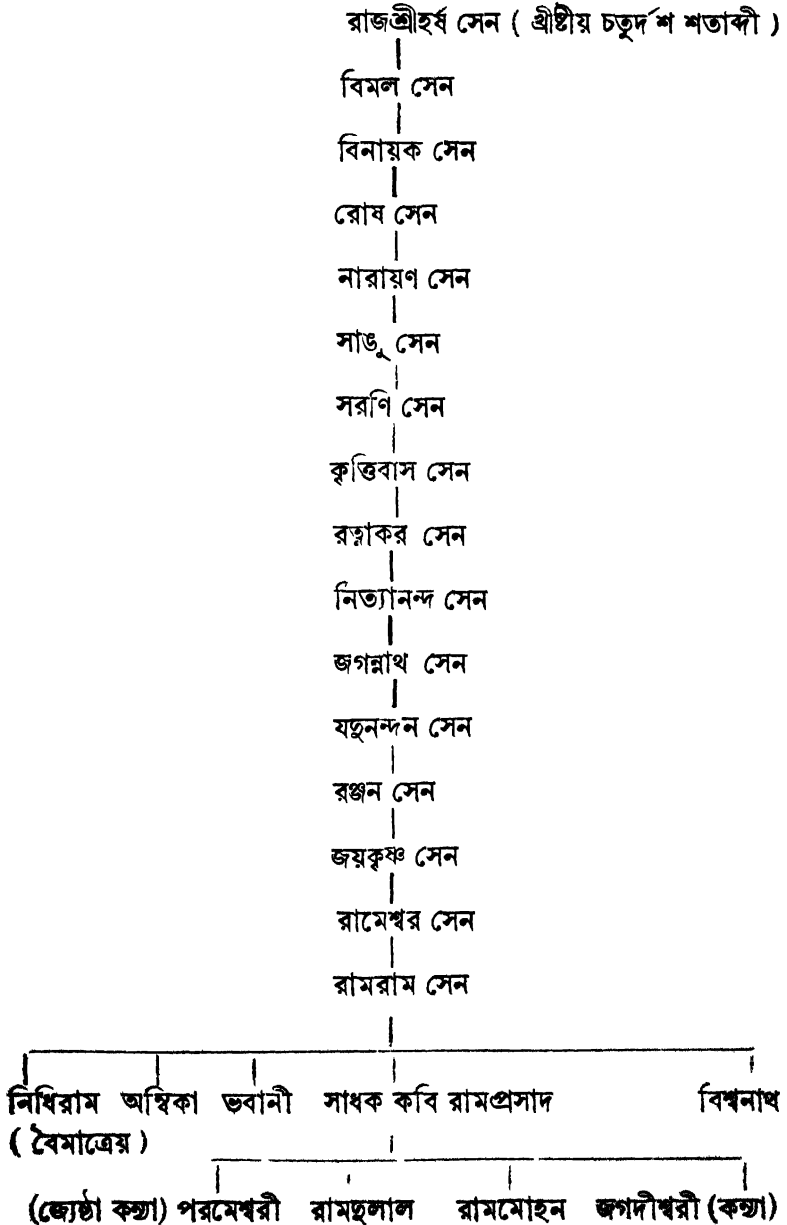
"নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু,
মনুজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা॥
সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা।
হরিনাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর-ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥"

রামপ্রসাদের এই গানটি উল্লেখ করিবার একমাত্র কারণ তাঁহার জন্ম-সন জানার জন্য। রামপ্রসাদের জন্ম-সন লইয়া জীবনীকারগণের মধ্যে মতবিরোধ আজও বর্তমান। রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দরের" বংশ-পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জন্ম-সনের কোন উল্লেখ করেন নাই। উপরের এই হেঁয়ালীর প্রকৃত অর্থ আজও অজ্ঞাত।

"সোম-মৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা।" এই অদ্ভুত অংশটির অর্থ কি! বাহ্যতঃ সাধারণ অর্থে পাঁচটি নাম বোঝা যাইতেছে। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও রবিজ। রবিজ অর্থ শনি। ধারণা করিতে পারি যে, এই গানটির মধ্য দিয়া রামপ্রসাদ তাঁহার জন্ম-সময়ের গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রিগণের মতে, রামপ্রসাদের বর্ণনা অনুযায়ী ১১২৭ সনে গ্রহের এইরূপ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারা যায় যে সাধক কবির জন্ম-সন ১১২৭। অবশ্য কেহ

কেহ রামপ্রসাদের জন্ম-সন ১১২৯ বা আর কিছু পরে বলিয়া অনুমান করেন।

রামপ্রসাদের বংশপঞ্জিকারদের মতে শ্রীহর্ষ সেনই প্রসাদী বংশের পূর্বপুরুষ। কিন্তু রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে' উল্লেখ করিয়াছেন—

"ধনহেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাসতুল্য কীর্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥"

এখন প্রশ্ন কৃত্তিবাস কে? তাঁহার সঠিক পরিচয় কি? বংশ-পঞ্জিকারদের মত অনুসারে শ্রীহর্ষ সেন প্রসাদী বংশের পূর্বপুরুষ ধরিয়াই আলোচনা শুরু করা যাক। শ্রীহর্ষ সেন ছিলেন সার্থক চিকিৎসক, তাঁহার সার্থক চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া নবাব ফকিরুদ্দিন তাঁহাকে সেন-ভূমপ্রদেশের জমিদারী এবং রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর হইতে তিনি রাজা হর্ষসেন নামে পরিচিত।

রামপ্রসাদ নিজে 'বিদ্যাসুন্দরে' যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতেই তাঁহার বংশ-পরিচয় অবগত হইতে পারিব—

"ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাসতুল্য কীর্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ-সমুদ্ভূত ধীর সর্ব-গুণ-যুত,
ছিলা কত শত মহাশয়।
অনাচার দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।

প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কলিকার,

কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।

যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥

ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

পরম বৈষ্ণব কলিকাতা নিবাস॥

ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।

আমাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম॥

সর্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতি অম্বিকা।

তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥

গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥

জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।

মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদ ছায়া॥

শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।

শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥

শ্রীমতি পরমেশ্বরী সর্বজ্যেষ্ঠা সুতা।

শ্রীকবিরঞ্জন ভণে কবিতা অদ্ভুতা।"

ইহা হইতে পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় যে, রামপ্রসাদের পিতামহের নাম রামেশ্বর এবং পিতা রামরাম সেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র নিধিরাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামপ্রসাদেব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দ্বিতীয়া স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর গর্ভে চারিটি সন্তান। সর্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা ভবানী দেবী। তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ এবং সর্ব কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। অনুজ বিশ্বনাথ, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অম্বিকা এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরামের বিষয় বর্তমানে সঠিক কিছু জানা যায়

না। তবে কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত ভগ্নী ভবানীর বিবাহের উল্লেখ আছে এবং দুই ভাগিনেয় জগন্নাথ ও কৃপারাম-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে' সঠিকভাবে নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। এমন কি নিজ স্ত্রী সম্বন্ধেও তিনি নির্বাক। তিনি শুধু দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপালের উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয় "বিদ্যাসুন্দর" রচনার সময় তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয় নাই। অথচ রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়া যান নাই। রামমোহনের জন্ম উপলক্ষেই রামপ্রসাদ "এ সংসার ধোকার টাটি" এই গানটি রচনা করেন। তাই আজো গোঁসাই রহস্য করিয়া গান রচনা করেন—"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা, কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি।"

॥ জীবনী ॥

পিতামাতার আদরের দুলাল রামপ্রসাদ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের পাঠ-শালায়। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের পাঠশালার শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত সম্পূর্ণ করেন। ছেলের অদ্ভুত মেধার পরিচয় পাইয়া পিতা আনন্দিত হন। তিনি নিজে একজন কবিরাজ সুতরাং পুত্রকেও কবিরাজ করিবার বাসনায় গ্রামের সংস্কৃত টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন। অল্পকালের মধ্যে রামপ্রসাদ ব্যাকরণ ও কাব্যে যথেষ্ট পারদর্শী হইয়া ওঠেন। পিতার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, পুত্র রামপ্রসাদ যেন পৈত্রিক ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু যতই দিন যায় রামপ্রসাদের মনোযোগ সেই দিকে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। নানা বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ

আগ্রহ আছে কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রতি তেমন আকর্ষণ নাই। তাঁহার ইচ্ছা, আরো কয়েকটি ভাষা আয়ত্ত করেন। সেই সময় মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং সাংসারিক জীবনে সুবিধার হইবে চিন্তা করিয়া পিতা তাঁহাকে পারসী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে অনুমতি দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ভাষা দুইটিতে দক্ষতা অর্জন করিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষা তাঁহার আয়ত্তে আসিল।

যত দিন যায় পুত্রের সংসারের প্রতি আকর্ষণ ততই যেন কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া পিতা বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। পুত্রকে বিবাহ দিয়া সংসারের মধ্যে লইয়া আসা যাইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া পিতা পুত্রের বিবাহের আয়োজন শুরু করিলেন। বাইশ বৎসর বয়সে পিতা রামপ্রসাদের বিবাহ দেন। কুলপ্রথা অনুসারে কুলগুরু নবপরিনীতা দম্পতিকে দীক্ষা দেন।

মানুষের যেমন আশার শেষ নাই তেমনি দুঃখেরও অন্ত নাই। বড় আশা করিয়া রামরাম সেন পূর্বেই বিবাহ দিয়াছিলেন, পুত্রকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে সংসারের প্রতি আকর্ষণ ততই ক্ষীণ হইতেছে। দিনের পর দিন আনমনাভাব বাড়িয়াই চলিয়াছে। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটি তীব্র বেদনা মাঝে মাঝে তাঁহাকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিতেছে। মন চায় শান্তি, চায় নির্জনতা—কোলাহল হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইতে চায় মন। রামপ্রসাদের পিতা নিজে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তাই পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতেন না।

কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইবার পর হইতে রামপ্রসাদ মনের আনন্দে সাধনরাজ্যে ডুবিতে লাগিলেন। মন চায় শান্তি আর নির্জনতা। কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় নির্জনতা? এই শান্তি আর অশান্তির মধ্যে পড়িয়া রামপ্রসাদের মন যখন দোদুল্যমান ঠিক সেই সময় হঠাৎ আলোর সন্ধান পাইলেন রামপ্রসাদ। সেই সময় সাধকশ্রেষ্ঠ আগম-বাগীশের আগমন হয় কুমারহট্টে। তখনকার দিনে তান্ত্রিক পণ্ডিত ও

সাধক হিসাবে আগমবাগীশের খ্যাতি ছিল প্রচণ্ড। গ্রামের মানুষ ছুটিয়া চলিল সাধকের কাছে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য। রামপ্রসাদের কাছে উপস্থিত হইল সুবর্ণ সুযোগ। রামপ্রসাদ সুযোগ বুঝিয়া একদিন নির্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এ তো আর সাধারণ সাক্ষাৎ নয়, এ যে মণিকাঞ্চন যোগ।

জহুরি জহর চেনে, সাধকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশও রামপ্রসাদকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—এ সামান্য মানব নহে। উর্বর জমি পাইলে কাহার না কৃষি করিতে ইচ্ছা হয়? আগমবাগীশও আনন্দে অধীর। 'লাখ লাখ গুরু মেলে চেলা মেলে এক।' যেমন গুরু তেমন শিষ্য।

আগমবাগীশ কালবিলম্ব না করিয়া রামপ্রসাদকে তন্ত্রসাধন বিষয়ে নানা উপদেশ দিতে শুরু করিলেন। রামপ্রসাদ দ্বিগুণ উৎসাহে আগমবাগীশের উপদেশমত তান্ত্রিক সাধনায় ডুবিয়া রহিলেন। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া রামপ্রসাদের পিতা একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন। পুত্রের ধর্মভাবের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাবিয়া অস্থির, কারণ সংসার তো আছে। তাঁহার ভূ-সম্পত্তি বিশেষ কিছু নাই, কোন প্রকারে অভাবের সংসার সুখে-দুঃখে চলিয়া যায়। কিন্তু তাঁহারও তো দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। তাঁহার অবর্তমানে রামপ্রসাদকেই সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। তখন আত্মভোলা রামপ্রসাদ সংসার চালাইবে কেমন করিয়া?

যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সংসার চলে, সেই কারুনিক পরমেশ্বর কি আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ভার লইবেন না? উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতা এই চিন্তা করিয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেন। রামপ্রসাদ মনের আনন্দে বিশেষ আগ্রহে পূজাপাঠ জপ-ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু মানুষের চিরকাল সমান যায় না। হঠাৎ একদিন রামপ্রসাদকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন।

* * * *

হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়াতে রামপ্রসাদের মাথায় বিনামেঘে

বজ্রাঘাত ঘটিল। এতদিন তিনি যে আচ্ছাদনের তলে ছিলেন তাহা যে এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ উৎপাটিত হইয়া যাইতে পারে তাহা আত্মভোলা সাধক কবির স্বপ্নের অতীত। এতদিনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে হঠাৎ এক দমকা হাওয়া ওলটপালট করিয়া দিল।

মৃত্যুর সময় পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই। রাখিয়া গিয়াছেন স্নেহময়ী জননী, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারের সকলকে। তাঁহাদের লইয়া তিনি অকূল সাগরে পড়িলেন।

কিন্তু কি করিবেন? সংসারের কোন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই; জীবিকার্জনের কোন উপায় তাঁহার জানা নাই। চিন্তা করিতে করিতে রামপ্রসাদ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এই ক্ষুদ্র সংসারের বোঝা যে এত ভারী তাহা পিতা বর্তমানে রামপ্রসাদ এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করিতে পারেন নাই।

অথচ সেই বিপর্যয় তাঁহার সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে মন্থর করিয়া দিয়াছে, সংসারের সকল আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে বিষাদের কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রামপ্রসাদ তাঁহার একমাত্র আরাধ্যদেবী আদ্যাশক্তির নিকট করুণা প্রার্থনা করিলেন।

রামপ্রসাদ পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় পূর্বেই দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। এখন শুধু ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলেই তো চলিবে না। সংসারের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা তো তাঁহাকে করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস রামপ্রসাদকে কলিকাতা আনিবার ব্যবস্থা করেন। কারণ কলিকাতায় তখন বহু ধনী লোকের বাস ছিল, একটু চেষ্টা করিলে রামপ্রসাদের চাকুরী জুটিয়া যাইবে।

তাই রামপ্রসাদকে অভাবের তাড়নায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। আত্মভোলা রামপ্রসাদ একাকী কলিকাতা যাইবে শুনিয়া গর্ভধারিণী জননী তো একেবারে ভাবিয়া অস্থির। যে কোন দিন বাড়ীর বাহিরে যায় নাই, সে কি করিয়া কলিকাতায় একাকী গিয়া চাকুরী করিবে?

তবুও যদি এবার সংসারের প্রতি তাহার একটু আকর্ষণ আসে, শুধু এই প্রার্থনা তিনি জানাইতে শুরু করিলেন আদ্যাশক্তির কাছে।

কলিকাতায় আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে গরাণহাটার নবরঙ্গ-কুলাধিপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোলকচন্দ্র ঘোষালের বাড়ীতে। আবার কেহ কেহ বলেন, বাগবাজারের মদন-মোহনের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। এবিষয়ে কোন্‌টি সঠিক তাহা বলা কঠিন।

শিশু যেমন কিছু পাইলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, ঠিক সেই রকম অল্প মুহুরীগিরি পাইয়া সাধক রামপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা জগজ্জননী কৃপাময়ী আদ্যাশক্তির করুণার অন্ত নাই। তাই মনিবের পাকা খাতায় "আমায় দাও মা তবিলদারী", আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।" লিখিয়া রামপ্রসাদ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন প্রসন্না জগজ্জননীকে।

রামপ্রসাদ চিরদিনই মায়ের নামে বিভোর হইয়া থাকিতেন। মুহুরীগিরি পাইয়া তিনি মায়ের নামে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার হুঁশ নাই যে তিনি কুমারহট্ট ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া মুহুরীর চাকুরী লইয়াছেন মনিবের হিসাবের খাতা লিখিবার জন্য। সব কিছুই ভুলিয়া গিয়াছেন মায়ের নামে বিভোর হইয়া। হিসাব লিখিবার সুন্দর খাতা পাইয়া রামপ্রসাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ভক্তির আতিশয্য ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। পাছে ভুলিয়া যান তাই হিসাবের পাকা খাতাতেই লিখিয়া রাখিতে শুরু করেন। ভাবে এতই বিভোর যে যাহার মধ্যে থাকিবে কড়া গণ্ডা ক্রান্তি আর লেনদেনের হিসাব, তিনি গানের পর গান রচনা করিয়া চলিলেন সেই হিসাবের পাকা খাতায়।

দেখিতে দেখিতে মনিবের পাকা খাতা ভরিয়া উঠিল দুর্গানাম, কালীনাম ও প্রসাদী-সংগীতে। জাবেদা খাতা কালীনাম বা গান

রচনার জন্য নয় তাহা জানাজানি হইলে যে তাঁহার চাকুরী থাকিবে না
একথা একবারও তাঁহার মনে হয় নাই।

যতই দিন যায় রামপ্রসাদের তন্ময়তা ততই বাড়িয়া চলে। ঊর্ধতন কর্মচারীগণ প্রসাদের হাব-ভাব লক্ষ্য করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনিবের নিকট গিয়া পুনঃ পুনঃ নালিশ করিতে শুরু করিলেন। প্রথম দিকে দয়ালু মনিব বিশেষ কিছু বলেন নাই। দিনের পর দিন নালিশ শুনিতে শুনিতে মনিব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামপ্রসাদের সাথে হিসাবের খাতা মনিবের সম্মুখে হাজির করিরা ঊর্ধতন কর্মচারী বলিলেন, "হুজুর, প্রসাদ পাকা খাতাটা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। এ গাগলামি ছাড়া আর কি, হুজুর?"

হিসাবের পাকা খাতাখানি হাতে লইয়া মনিব দেখিলেন—আষ্টেপৃষ্ঠে কালীনাম, দুর্গানাম আর মায়ের নাম-গান! পাতা উল্টাইতেই প্রথমে চোখে পড়িল—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই মা শঙ্করী॥
পদরত্নভাণ্ডার সবই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখা তাঁরি।
অর্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মতো পদ পাই তো সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি।"

পাতার পর পাতা শুধু গান আর গান। ধার্মিক মনিব মিত্র

মহাশয় উহা তন্ময়ভাবে পড়িতে শুরু করিলেন। বার-বার তিনি পাঠ করিলেন, 'আমি বিনা মাহিনার চাকর, তোমার চরণ-ধূলার অধিকারী।' মিত্র মহাশয় মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে এ তো সাধারণ পাগল নয়। এ যে "পাঁকাল মাছ", সারাক্ষণ পাঁকের মধ্যে থাকিয়াও যাহার দেহে এক বিন্দু পাঁক স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে তো সাধারণ মানব নয়। তাঁহাকে মুহুরীগিরির সাহায্যে বাঁধিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

তাই তিনি রামপ্রসাদকে সস্নেহে বলিলেন—"এ সংসারে তুচ্ছ কাজ করিবার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করনি। তোমার কর্মক্ষেত্র সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। তুমি ঘরে গিয়ে মায়ের নাম কর তাতে দেশের ও দশের উপকার হবে।" দয়ালু মনিব বৃত্তিসহ রামপ্রসাদকে ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। মনিবের দয়ার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গান ধরিলেন—

"মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ না রে সর্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্ না রে ব'সে ব'সে
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগাতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধ'রবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্নতোড়া, বাঁধ রে যতনে ক'ষে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে॥

রামপ্রসাদ এবার স্বদেশের পথে বিভোর হইয়া চলিলেন—

"আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।"

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের বোঝা লাঘব করিবার জন্য রামপ্রসাদকে মুহুরীগিরি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার মন মায়ের নামে বিভোর তাঁহার কি আর চাকুরীতে মন বশে? বাধাহীন জীবন

যাঁহার কাম্য, তাঁহার মন তো মুক্তির জন্য আঁকুপাকু করিবে তাহা আর বেশী কি?

কলিকাতায় মহুরীগিরি করিবার সময় রামপ্রসাদ বিভোর হইয়া মায়ের নাম ও সংগীত রচনা করিতেন তবুও তাঁহার মন কেন যেন আঁকুপাকু করিত মুক্তির জন্য। ইচ্ছাময়ীর কৃপায় একদিন সেই আঁকুপাকু দূর হইয়া গেল। চাকুরীর বাধা-নিষেধ আর থাকিল না। তিনি আজ মুক্ত—বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, বিভোর মায়ের নামে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসায় গর্ভধারিণী মাতার আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি যুক্তকরে জগজ্জননীকে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। মাতার কাছ থেকে কোন বাধা না পাইয়া নিত্য-নূতন গানের প্লাবনে রামপ্রসাদ একেবারে ডুবিয়া রহিলেন।

তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গিয়া আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া মায়ের গান করিতেন। পতিতপাবনী কুলকুলনাদিনী গঙ্গাবক্ষে সেই গানের সুর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইত।

সেই সংগীত-সুধায় যেমন সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হইত তেমনি পথ-শ্রান্ত পথিকও গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আবেগময় চিত্তে সংগীতসুধা পান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া যাইত। এইভাবে প্রতি-দিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান করিয়া চলিতেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন হুঁশ থাকিত না।

একদিন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে হালি-শহরের নিকট দিয়া যাইবার সময় রামপ্রসাদের সুললিত কণ্ঠে মা-এর নাম-গান শুনিতে পান। যতক্ষণ রামপ্রসাদের গান চলিল ততক্ষণ তিনি নৌকা গঙ্গাবক্ষে দাঁড় করাইয়া একান্ত মনে সংগীতসুধা পান করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গভীরভাবে মগ্ন আর রামপ্রসাদ মায়ের নামে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। বেশ কিছু সময় এইভাবে চলিবার পর রামপ্রসাদ সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া কূলে উঠিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সাথে আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

রতনে রতন চেনে, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মত মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভায়ও 'পঞ্চরত্নের' তখনকার দিনে প্রচুর খ্যাতি ছিল। সাধক রামপ্রসাদকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি একজন সামান্য লোক নন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে গুণী ব্যক্তি, সুতরাং গুণের সমাদর করিতেও জানিতেন। গুণী পাইলেই আদর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সভায় স্থান দিতেন।

সাধক-চূড়ামণি আগমবাগীশ, আদিরসের কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের কথা আজ কে না জানে? তাঁহারা সকলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার "রত্ন" ছিলেন। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে আজও অমূল্য সম্পদ। তাই রামপ্রসাদকেও তাঁহার চাই, রামপ্রসাদের প্রতিভার পরিচয় তিনি পূর্বেই পাইয়াছেন। তাই আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে রাজসভায় সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। রাজসভার আহ্বান পাইয়া রামপ্রসাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এক স্থান হইতে মুক্তি পাইতে না পাইতেই আবার বাঁধন?

যিনি অন্তরের অন্তরস্থল মায়ের চরণে সঁপিয়া দিয়াছেন তাঁহার কাছে রাজার স্থান কোথায়? ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সকলই যিনি মা-এর চরণে অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আবার ভয় কি? 'কাজ কি মা সামান্য ধনে'—রাজার ধনে তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই, কারণ যে সামান্য 'ধন পড়ে রবে ঘরের কোণে।' যে জিনিস ঘরের কোণে পড়ে থাকবে কিন্তু তাঁহার দ্বারা ঘর ভোরে উঠবে না সেই ধন তো রাম-প্রসাদের কাম্য নয়, কারণ পার্থিব ধনের তুলনায় অপার্থিব ধনের প্রতি তাহার লক্ষ্য বেশী। "যদি দাও মা অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে।"

তাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বিনীতভাবে অসম্মতি জানাইলেন। এই অসম্মতিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এতটুকু অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং মুগ্ধ হইলেন প্রসাদের বৈরাগ্য দেখিয়া। প্রত্যাখান সত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একশত বিঘা নিস্কর ভূমি পুত্রপৌত্রাদি সহ যাহাতে ভোগ করিতে

পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। "আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী" —নুন খেলে গুণ গাইতে হয়। প্রসাদ তো নিমকহারাম নন তাই প্রতিদানের ব্যবস্থা করিলেন "বিদ্যাসুন্দর" রচনার মাধ্যমে।

রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দর", ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যা-সুন্দর" প্রভৃতি সৃষ্টির পিছনে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা ও উৎসাহ ছিল।

হালিশহর যেমন শাক্ত প্রধান ছিল তেমনি তথায় বহু বৈষ্ণবও বাস করিত। এই শাক্ত আর বৈষ্ণবের মধ্যে বিবাদ লাগিয়া থাকিত। বৈষ্ণবগণ শাক্ত ধর্মের নিন্দা করিতেন, আবার সেই শাক্তগণও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। শাক্ত আর বৈষ্ণবের এই ঝগড়া তখন প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল।

এই সময় বহুলোক রামপ্রসাদের পিছনে লাগেন। নানাপ্রকার অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারিত হইতে লাগিল। আজুগোঁসাইয়ের নাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ইনি ছিলেন রামপ্রসাদের সমসাময়িক একজন বৈষ্ণব। আজুগোঁসাই রামপ্রসাদের গীতের সকল উক্তির যেমন প্রত্যুত্তর দিতেন, তেমনি তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণও নিক্ষেপ করিতেন এবং সাথে সাথে আপন বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনে ত্রুটি করিতেন না।

রামপ্রসাদের জন্য এখনও আজুগোঁসাইয়ের কিছু গান লোকমুখে প্রচলিত আছে।

রামপ্রসাদের "ডুব দেরে মন কালী ব'লে" গান শুনিয়া আজুগোঁসাই গান বাঁধিলেন—

"ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফো নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ী।
তোমার হ'লে পরে জ্বরজাড়ী, মন!
যেতে হবে যমের বাড়ী॥

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস নে মন, ধর গে ভেসে
শ্যামা কি শ্যামার চরণতরী ॥"

প্রসাদের "আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্প-তরু গিয়ে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।" গানের উত্তরে আজু গোস্বামী নিম্নলিখিত ব্যঙ্গানুকৃতি রচনা করেন—

"কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাসনে রে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন, নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্তে পারিস,
মাঝ গঙ্গাতে ভরা ডুবি ॥
বাঁশ-বনে গিয়ে ডোম কানা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেযে কল্প-তরুর তলায় গিয়ে কি ফল
নিতে কি ফল নিবি ॥'

উপরের গান কয়টি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি আজুগোঁসাইয়ের রচনা-শক্তি কত প্রখর ছিল। ভাষা অদ্ভুত, বিদ্রূপের ভঙ্গী সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই আজুগোঁসাই কে? কি তাঁহার পরিচয়? রসিক বৈষ্ণব কবির আসল নাম কি তাহা সঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। বিভিন্ন নামে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিচিত ছিলেন, অযোধ্যানাথ গোসাঁই, অচ্যুত গোসাঁই বা পাগলা গোসাঁই।

আজুগোসাঁই বিশেষ স্বনামধন্য পুরুষ নহেন। কিন্তু রামপ্রসাদের পাশাপাশি তিনি এমনভাবে আসিয়া দাঁড়ান যে, সাধকের সঙ্গে তিনিও আজ অমর হইয়াছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে এই গ্রামে আসিতেন রামপ্রসাদের গান শুনিতে। আজুগোসাঁইও উপস্থিত থাকিতেন। বাহ্যজ্ঞানহীন

হইয়া রামপ্রসাদ মায়ের গান করিতেন, আজুগোসাঁই বিদ্রূপ করিয়া সেই গানের জবাব দিতেন। এইভাবে আসর জমিয়া উঠিত। একদিন আজুগোসাঁই রামপ্রসাদের ভাবের ব্যাঘাত করিলে রামপ্রসাদ বলেন, "কর্মের ঘাট, তৈলের কাট আর পাগলের ছাঁট—ম'লেও যায় না।"

"পাগলের ছাঁট" যে আজুগোসাঁইকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বলেন, "কর্মের ডোর, স্বভাব চোর, মদের ঘোর ম'লেও ঘুচে না।"

"মদের ঘোর" কথাটি রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইয়াছিল। কারণ প্রবাদ আছে, রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে সুরাপান করিতেন।

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমনই মোহিনীশক্তি রহিয়াছিল যে, অতিপাষণ্ড ব্যক্তিও তাঁহার গান শুনিয়া কিছু সময়ের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইত।

সেই সময় হালিশহরের উপর দিয়া মাঝে মাঝে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। একদিন এইরূপ যাইবার সময় তিনি দূর হইতে রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরিচারকদিগকে "কে গান করিতেছে" অনুসন্ধান করিতে বলেন। পরিচারকেরা নৌকার উপর উঠিয়া কূলে রামপ্রসাদকে গান করিতে দেখিয়া নবাবকে জানায় যে, একজন হিন্দু গঙ্গায় আকণ্ঠজলে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। নবাব তখনই কূলে নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ দেন। কিছুক্ষণ গান শোনার পর তাঁহাকে নৌকায় আসিতে সাদর আহ্বান জানান।

নবাবের আহ্বান পাইয়া রামপ্রসাদ বিনা আপত্তিতে নৌকায় গিয়া নবাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তখন তাঁহাকে গান শোনাইতে অনুরোধ করেন।

নবাবের গান শোনার অভিপ্রায়ে রামপ্রসাদ প্রথমে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ নবাবকে কি গান শোনানো যায়। প্রথমে তিনি

একটি হিন্দী গজল গাইতে শুরু করিলেন। গান শেষ হইলে নবাব বলিলেন, "ও গান নয়, তুমি যে গান এতক্ষণ গাইতেছিলে, তাহাই আমাকে শোনাও।"

একথা শুনিয়া রামপ্রসাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বরচিত মাতৃ-সংগীত গাইতে শুরু করিলেন। গানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এতই মুগ্ধ হইলেন যে রামপ্রসাদকে মুর্শিদাবাদ যাইবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন।

কিন্তু রামপ্রসাদ ঠিক সেই সময় তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবে পরে একসময় মুর্শিদাবাদ গিয়া সত্য রক্ষা করেন।

প্রসাদের হৃদয় মন ভাব-সমুদ্রে ডুব দিবার জন্য আঁকুপাকু করিতেছে। ক্ষুদ্র সংসারের বোঝা আজ আর ভার হইয়া তাঁহার নিকট নাই, কারণ সে যে মহেশ্বরীর খাস তালুকের প্রজা, স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা তাঁহার সকল দায়িত্ব নিজেই লইয়াছেন।

পুরাতন মনিব মিত্র মহাশয়ের মাসিক বৃত্তি হইতে তাঁহার মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হইত। ইহার অতিরিক্ত বাসনা তাঁহার কিছুই ছিল না।

অথচ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতায় সংসারের সকল দৈন্য-দশা দূর হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের দৈন্য তো দূর হয় নাই।

তাই মনের দৈন্য দূর করিতে হইবে। এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, এতদিন গানের দ্বারা মনরূপী ভূমিকে তিনি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়াছেন। এবার ফসল ফলাইবার পালা, তাই "ডুব দে রে মন কালী বলে"—ভাব রাজ্যে ডুব দিলেন। রামপ্রসাদ শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শক্তির আরাধনাই তাহার ধর্ম-কর্ম সব কিছু, শক্তি সাধনার জন্য চাই উপযুক্ত স্থান।

রামপ্রসাদের বাটীর নিকটেই ছিল একটি উদ্যান, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ এই স্থানটি ছিল অতীব নির্জন। সাধনার পক্ষে অতি

উত্তম বিবেচনা করিয়া তিনি এই স্থানটি বাছিয়া লইলেন এবং শক্তি সাধনের জন্য একটি "পঞ্চবটী" রোপণ করিয়া "পঞ্চমুণ্ডির" আসন স্থাপন করেন। ইহাই রামপ্রসাদের সুবিখ্যাত সিদ্ধাসন। আজও তাহা প্রসাদপীঠে বর্তমান।

সাধনার উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রামপ্রসাদ "হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" ডুব দিয়া সাধনা শুরু করিলেন। বাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক দিনের পর দিন কমিতে আরম্ভ করিল। দুইবেলা আহারের সময় ছাড়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি বিশেষ তিথিতে বাড়ীর লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না। এইভাবে সাধনরাজ্যে তাঁহার মন ক্রমশই লীন হইতে লাগিল।

কত দিন কত রাত্রি কত অমাবস্যার মহানিশা কাটিয়া গেল, কত পূর্ণিমার অবসান ঘটিল তবু মায়ের দর্শন লাভ হইল না। শুরু হইল মা ও ছেলের লুকোচুরি খেলা। মান-অভিমানের পালা চলে মা ও ছেলের মধ্যে। ইষ্ট লাভে যতই বিলম্ব হইতেছে রামপ্রসাদের হৃদয় ততই ব্যথিত হইয়া ওঠে। ব্যথিত হৃদয়ে রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই॥"

দিনের পর দিন যায় আর ভাবনা বাড়ে। মন আর কিছুতেই শান্ত থাকিতে চায় না। এই হতাশা প্রকাশ পায় গানের মধ্য দিয়ে—

"মা মা বলে আর ডাকব না,
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী;
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,

ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব ;
মা ব'লে আর কোলে যাব না.
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না,
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা।"

রামপ্রসাদ জগজ্জননীকে সাক্ষাৎ গর্ভধারিণীর মত দেখিতেন, সেইজন্য কখন তাঁহার কাছে আবদার করিতেন, আবার কখন অভিমান, আবার কখন বা ক্রোধ প্রকাশ করিতেন।

এই ভাবে আশা আর নিরাশার দোলায় বেশ কিছু দিন কাটিল। অবশেষে একদিন সন্তানের নিকট মাতার পরাজয় ঘটিল। জগজ্জননী এবার গর্ভধারিণীরূপে দর্শন দিলেন। মাতৃদর্শন পাইয়া রামপ্রসাদ আনন্দে বিভোর, মাতৃনামে ভরপুর।

একদিন এক অপরূপ দিব্যজ্যোতি তাঁহার শরীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রথমে প্রতিবেশীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইল। এই কি তাঁহাদের সেই রামপ্রসাদ! যাঁহাকে তাহারা কারণে-অকারণে ব্যথা দিয়াছেন!

কোন দিকেই রামপ্রসাদের কোন লক্ষ্য নাই। মাতৃনামে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ গানের পর গান রচনা করিয়া চলিলেন।

আজ রামপ্রসাদ মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা বলিতেছেন, সাধক তাঁহার মৃন্ময়ী "মা'কে ভোগ নিবেদন করেন আর মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া আদরে-দেওয়া ভোগ নিঃশেষ করেন। এমন বহু ঘটনা প্রচলিত আছে।

আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দিনে মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না, তাই আলোচনা করিতে ভয় হয়। কারণ আমরা বিজ্ঞানের যুগের মানুষ সকল জিনিসকে দূরবীনের মাধ্যমে দেখিতে চাই, নতুবা বিশ্বাস করি না। সকল জিনিসকে দূরবীণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। Realization বা অনুভূতি, উপলব্ধি প্রভৃতিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না। তাহার জন্য চাই দিব্য-দর্শন।

মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহাদের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনার কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু সব কিছুকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার উপায় নাই। তাই তাহাকে সাধারণত আমরা পাগলামি বা খেয়াল বলিয়া থাকি।

সংশয়, দ্বিধা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুধু এই যুগের মানুষের নয়। বহু পূর্বেও এই ধরনের দ্বিধা, সংশয়, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সংগ্রাম যে বহু সাধকের মনে দেখা দিয়াছে তাহা এই গানের মাধ্যমে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারি—"মন বলে তুমি আছ, চোখ বলে তুমি নাই।" এই চোখ আর মনকে এক করার জন্য চাই সাধনা। এই সাধনার দ্বারাই দিব্যদৃষ্টির জন্ম। আর তাহার সাহায্যে মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করিয়া তোলা যায়।

চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার মত সামর্থ্য রাখি না সত্য কিন্তু মহাপুরুষের জীবনের অলৌকিক ঘটনাকে মাথার খেয়াল বা পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিবার মত ধৃষ্টতা রাখি না। কয়লার খনিতে মণি পাওয়া যায় বলিয়া মণি আর কয়লা এক দরে বিকায় না। মণি মণিই থাকে কয়লা কয়লাই থাকে। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সংসারে মেকী জিনিসের প্রচলন আছে বলিয়াই তো খাঁটি জিনিসের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ।

রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু নানাকারণে দিন ধরিয়া সেগুলিকে মেরামত করা হয় নাই। একদিন তাই প্রসাদ নিজেই বেড়া বাঁধিতে বসিলেন এবং অপর দিকে বসিয়া

বেড়ার ছিদ্র পথে দড়ি ফিরাইয়া দিতে কন্যা জগদীশ্বরীকে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে। হঠাৎ জগদীশ্বরী পিতাকে কিছু না বলিয়া কার্য উপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কন্যার অবর্তমানে দড়ি ঠিক ফিরিয়া আসিতেছে। তন্ময় হইয়া সাধক রামপ্রসাদ আপন কার্যে মগ্ন। কন্যা জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যা আশ্চর্য হইয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল—"কে দড়ি ফিরাইয়া দিল?"

"কেন, তুমিই তো দড়ি ফিরাইতেছিলে!"—রামপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া কন্যাকে উত্তর দিলেন।

জগদীশ্বরীর নিকট হইতে প্রকৃত কথা শুনিয়া রামপ্রসাদ স্তম্ভিত। আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, স্বয়ং জগজ্জননী কন্যারূপে আসিয়া তাঁহার বেড়ার দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতায় হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে গান ধরিলেন—

"মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কোপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
ম'লে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত,
কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।

ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,

কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলেই করিবে হরণ,

দোসর বস্ত্র গায় দিবে চার কোণা,

মাঝখানে ফাড়া ॥

যেই ধ্যানে এক মনে,

সেই পাবে কালিকা তারা ॥

বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,

রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥"

একদিন পরমাসুন্দরী একজন স্ত্রীলোক রামপ্রদাদের গান শুনিতে তাঁহার বাটীতে আসেন। তখন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে-ছিলেন। এজন্য স্ত্রীলোকটিকে কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইবেন বলিয়া রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিতে যান।

কিছুক্ষণ পরে স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটি নাই। চারিদিকে বহু খোঁজাখুঁজি করা হইল সত্য, কিন্তু তাঁহার কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপে চোখ পড়িতেই দেখিলেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা—"আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিলাম, তোমার কথামত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনরায় কাশী চলিলাম। তুমি সেখানে গিয়া আমাকে গান শুনাও।"

চণ্ডীমণ্ডপের লেখা পড়িয়া রামপ্রসাদ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। "মা" অন্নপূর্ণা স্বয়ং আসিয়াছিলেন দীনের গৃহে গান শুনিতে আর তিনি স্নানের জন্য তাহাকে গান শুনাইতে পারিলেন না, এই ক্ষোভে ও ব্যথায় রামপ্রসাদের হৃদয়খানি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া রামপ্রসাদ কাশী যাত্রা করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে আর কাশী যাইতে হইল না। পথিমধ্যে ত্রিবেনীর

নিকট যাইতে না যাইতেই তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল—"তোমায় আর কাশী যাইতে হইবে না, তুমি ঘরে বসিয়া আমাকে গান শুনাইও।"

রামপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা, তখন সাক্ষাৎ সরস্বতী যেন তাঁহার কণ্ঠে বসিয়া গানের পর গান রচনা করিয়া দিতে শুরু করিলেন আর রামপ্রসাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ঝরনাধারার মত তাহা বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। ভাবের ঘোরে গান ধরিলেন—

"আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান।
তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশিতে মলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী॥
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্বর্গ করতলে,
ভাবিলে রে এলোকেশী॥"

রামপ্রসাদ যখন মায়ের সাড়া পাইতেন তখনই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গান ধরিতেন আর অপার্থিব আনন্দে তাঁহার মন যে কোথায় খেলিয়া বেড়াইত, তাহা কে জানে ?

সাধক-জীবনে সাধনার রাজ্যে সাধকের মন যখন একেবারে লীন হইয়া যায় তখন এ জাতীয় অনেক অলৌকিক দর্শন যে হয় তাহার খবর কে রাখে ? সেইজন্য আমাদের নিকট আর একটি বিরাট জগতের খবর যেন প্রহেলিকা মাত্র।

তাইতো গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন ঃ—

"যা নিশা সর্বভূতানং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"

অর্থাৎ সবকিছুর ( সর্বভূতের ) নিকট যাহা অন্ধকার বলিয়া মনে হয়, সংযমী পুরুষের নিকট সেটাই হোল জাগ্রত।

সাধারণ মানুষের নিকট একটা বিরাট জগতের সংবাদ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু মহাপুরুষগণ দিব্য চক্ষের দ্বারা সেই জগতের যাবতীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

এই মহাপুরুষগণের জীবনের আলৌকিক ঘটনাবলীকে শুধু অন্তরের পরম শ্রদ্ধার-সহিত বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই।

পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়া রামপ্রসাদ কঠোর তান্ত্রিক সাথনায় মগ্ন, আহার-বিহার পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন, বাড়ী আসা যাওয়া একপ্রকার বন্ধ। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে আর তাঁহার মন বসে না। মাতা কেমন করিয়া সংসার চালান, রামপ্রসাদ তাহার কোনও খবর রাখেন না। কঠোর সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে তিনি মনকে বাস্তব জগৎ হইতে অনেক উপরে উঠাইয়া ফেলিয়াছেন।

তাঁহার 'পঞ্চমুণ্ডির' আশেপাশে লোকজন সাধারণতঃ যাইতে ভয় করিত। কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে গান শুনিবার জন্য তথায় আসিতেন। রামপ্রসাদ নিত্য-নূতন মায়ের গান রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন।

সেই সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করিতেন যে—রামপ্রসাদ যেন

এ জগতের মানুষ নহেন। তাঁহার দিব্য ভাব আর দিব্য কান্তি দেখিয়া মহারাজ মনে করিতেন যেন দেবলোক হইতে কোন দেবর্ষি নামিয়া আসিয়াছেন।

রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নানা বিষয়ে কথা বলিতেন, কিন্তু তাঁহার মন যে এ জগতে নাই তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিতেন।

অনেক সময় রামপ্রসাদের কথাবার্তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকিত না, তাই সাধারণ লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করিত।

মাঝে মাঝে, হয়তো কখন কখন বাড়ীতে আসিতেন, দারিদ্র্যের পীড়নে পত্নীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেন। মুহূর্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করিত। কিন্তু যখনই পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়া বসিতেন তখনই সব ভুলিয়া যাইতেন। তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার— কে কাহার ?

তান্ত্রিক সাধনায় 'পঞ্চমুণ্ডি'র আসন নির্মাণ করিয়া সেই আসনে বসিয়া মায়ের উপাসনা করাই প্রধান বিধি। এই সাধনায় প্রধানতঃ পশু, বীর, দিব্যভাবের অবতারণা।

তাই তাঁর গানেই প্রকাশ পায় –

"আমার মনের বাসনা জননী !
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথি ব, স অন্তে, চারিপাত্রে মায়া ডাকিনী
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল অন্তে ষড়্‌দলোপর-বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ অন্তে দিগদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষট্ কোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ অন্তে বায়ু-বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল-পঙ্কিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী শাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্রবীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী ॥"

তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্বপ্রথম জাগ্রত করিতে হয়। আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাধনা করিতে হইলে কুলকুণ্ডলিনীর শক্তিকে চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়। ছয়টি ভাগে নাড়ীর চক্রকে ভাগ করা হয়ঃ—

(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ, (৬) আজ্ঞাচক্র—এই ছয় প্রকার কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তোলেন তান্ত্রিক সাধকগণ।

তান্ত্রিক সাধনায় রামপ্রসাদ জীবন কাটাইয়াছেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গুরু সাধকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশের উপদেশমত রামপ্রসাদ বাহ্যিক পঞ্চ-ম-কার অবলম্বনে সাধনা শুরু করেন।

এইভাবে কঠোর বীরভাবের সাধনা করেন। এই সময় তিনি লোকের সহিত মোটেই কথা বলিতেন না। অহর্নিশ মায়ের নামে মগ্ন হইয়া থাকিতেন।

তান্ত্রিক সাধনার পঞ্চ-ম-কারের মধ্যে "সুরা" একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু তখনকার দিনে আমাদের দেশে মদ খাওয়াকে অতি হেয় বলিয়া গণ্য করা হইত। তাই রামপ্রসাদের নামে সুরাপানের অভিযোগে নানা অপবাদ প্রচলিত হয়। সেই জন্য রামপ্রসাদ গাহিতেন—

"সুরাপান করি না আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
( আমার ) মন-মাতালে মাতাল করে,
( যত ) মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,—
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে।"

বংশ-পরম্পরায় তান্ত্রিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রসাদ-পরিবারে চলিয়া আসিতেছিল। তাই তান্ত্রিক সাধনা তাঁহার মজ্জাগত। ইহাতে তিনি অতি সহজে সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি ?

যতই দিন যায় রামপ্রসাদের স্বভাব ততই শিশুর মতো হইতে লাগিল। তিনি যেন চার-পাঁচ বৎসরের বালক। সবদিকে সমদৃষ্টি, ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই, জগতের সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান প্রভৃতির প্রতি রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ উদাসীন।

রামপ্রসাদের এই উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরিবারের অন্যান্যরাই সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। তাই পুত্র রামদুলাল বলিয়াছেন, "...এই অবস্থায় সামান্য তুচ্ছ জিনিসে কষ্ট দেওয়া বৃথা, বিড়ম্বনা।"

• একদিন রামপ্রসাদের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর চারিদিক হইতে বহুলোক তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতে শুরু করিল। তাহারা সকলেই রামপ্রসাদের দিব্যকান্তি দেহ ও কবি-শক্তির স্ফূরণ এবং সুধামাখা মায়ের গান শুনিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা গর্ভধারিণী সকল সময় পুত্রের মঙ্গল কামনায় রত থাকিতেন। পুত্রের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি দেখিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। পুত্রের সাধনার কোন অসুবিধা হয়, এই ভাবনায় তিনি সাধ্যানুযায়ী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করিতেন।

কিছুদিনের মধ্যে মাতা সিদ্ধেশ্বরীর শরীর ভাঙিয়া পড়িল। নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রামপ্রসাদ চিন্তান্বিত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রসাদের স্ত্রী সর্বাণী শাশুড়ীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। রামপ্রসাদের গর্ভধারিণী জননী ইষ্টনাম করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে যে বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছিল, মাতার মৃত্যুর পর ঠিক তাহার বিপরীত। এতদিন তিনি স্নেহময়ী জননীর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আজ সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে রামপ্রসাদ একেবারে উদাসীন হইয়া সিদ্ধাসনে বসিয়া কঠোর সাধনা শুরু করিলেন।

ইহার পর একদিন অমাবস্যা তিথিতে "শব" সাধনা শুরু করেন গ্রামের নিকটস্থ শ্মশানে।*

কথিত আছে, বরাভয়াকরা আদ্যাশক্তি মহামায়া এই অমানিশিতে সাধনায় তুষ্ট হইয়া প্রসাদের সম্মুখে উপস্থিত হন।

গর্ভধারিণীর অভাবে প্রসাদের সংসার শূন্য হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন বোঝা, ভার, দায়িত্ব, অভাব তাঁহাকে সংসারের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

এতদিন সংসার দেখিতেন মাতা সিদ্ধেশ্বরী। তাই তাঁহার মৃত্যুতে প্রসাদ-পত্নী সর্বাণীকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। তাঁহার পরোলোক গমনে সর্বাণী মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিলেন যে সংসারে আপনজন বলিয়া কেহ নাই।

এবার সংসারের সকল প্রকার ভার পতিব্রতা স্ত্রী সর্বাণীর স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। শাশুড়ী জীবিত থাকিতে তাঁহার দায়িত্ব কিছু ছিল না, শুধু ছায়ার মত শাশুড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার কাজে সাহায্য করিতেন। শত অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি জানিতেন মাথার উপর বিরাট আচ্ছাদন আছে। কিন্তু আজ? একদিকে আপনভোলা স্বামী সাধনায় ব্যস্ত, অপরদিকে অসচ্ছল সংসারে গুরুভার লইয়া ঘরকন্নার কাজ শুরু করিলেন।

সংসারের অবস্থা সচ্ছল নয়। দিনের পর দিন দুঃখ-দারিদ্র্য

---

*কেহ কেহ বলেন, এই শবসাধনা "বড়তির বিলে" করিয়াছিলেন। স্থানটি বর্তমান ২৪পরগণা জেলার শ্যামনগর ও ইছাপুরের মধ্যবর্তী।

ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। মাতার মৃত্যুর পর থেকে রামপ্রসাদের বাড়ী আসা প্রায় বন্ধ। সেই সময় সর্বাণী সন্তানদের লইয়া কখন অর্ধাহারে কখন বা অনাহারে দিন কাটাইতেন। তবু আপনভোলা স্বামীকে অভাব-অভিযোগের কথা জানাইয়া বিব্রত করিতেন না। হঠাৎ একদিন বাড়ীতে আসিয়া সন্তানদের মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা উপবাসী।

হঠাৎ রামপ্রসাদের চমক ভাঙিয়া বাস্তব বুদ্ধির উদয় হইল। বুঝিলেন সন্তানাদির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁহার - কিন্তু কি করিবেন? ইচ্ছা করিয়া তিনি তো আর কর্তব্যের ত্রুটি করেন নাই। সর্বাণী তো তাহাকে অভাব অনটনের কথা জানাইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে এই কঠোর আত্মসংযমের কথা চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হন। সংসারে যদি কাহাকেও দেবীর আসন দিতে হয়, তবে সে পতিব্রতা বুদ্ধিমতী সর্বাণীকে।

এদিকে অনাহারক্লিষ্ট সন্তানাদির আহারের জোগাড় করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি করেন, তাঁহার কোন উপায় জানা নাই। তাই রামপ্রসাদ মাকে জানাইয়া উপায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

এদিকে আশ্চর্যভাবে তাঁহার বাড়ীতে আহাদির সংস্থান হইয়া গেল। আপনভোলা সাধক আসল কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে শুধু হাতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীতে আসিয়া আহারের আয়োজন দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল তিনি তো বাজারে গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু আনিবার কথা তো তাঁহার মনে ছিল না। স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলেন, "আহারের জোগাড় কোথা হইতে হইল?" সর্বাণী বলিলেন, "একটি ছোট বাগদি মেয়ে বাজার লইয়া আসিয়া বলিল ঠাকুর পাঠাইয়া দিয়াছে। তার আসতে একটু দেরি হবে।"

রামপ্রসাদের বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। জগজ্জননী বাগদি

মেয়ে রূপে আসিয়াছিল, তখনই আবার ভাবে বিভোর হইয়া "তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি" গান ধরিলেন।

এবার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা ভাবিয়া রামপ্রসাদ বাড়ীতে থাকিয়া সংসারের কাজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি যে তাঁহার কিছু ছিল না তাহা নয়। কিন্তু দেখাশুনার অভাবে সবই অদানে-অব্রাহ্মণে যাইতেছে। যখন তিনি বিষয়-কর্মে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করেন তখনই "তারা নামে সকলই ঘুচায়" এই বলিয়াই বিভোর হইতেন।

এই ভাবে নানা অসুবিধা-অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া সুখে দুঃখে সর্বাণীর দিন কাটিতে লাগিল। সংসারের সকল দুঃখের ভার মাথায় তুলিয়া নিয়া নীরবে নিঃশব্দে ঘরকন্না করেন—একদিনের জন্যও স্বামীর সাধনার বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই।

একদিন হঠাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পেয়াদা আসিয়া রামপ্রসাদকে জানাইলেন যে মহারাজ তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছেন। রামপ্রসাদের বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না যে নবদ্বীপাধিপতির জীবননাট্য শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। বিলম্ব করিলে সত্যরক্ষা হইবে না, এই চিন্তা করিয়া তিনি পেয়াদার সাথে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আর বিলম্ব সহ্য হয় না, তাই পেয়াদাকে তাড়াতাড়ি গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য বলিলেন। গ্রামের পথ ধরিয়া যাইতে গেলে জঙ্গল অতিক্রম করিতে হয়। জঙ্গলে ডাকাতের ভয়, তাই পেয়াদা যাইতে রাজী হইল না। রামপ্রসাদ একাকী গ্রামের পথ ধরিয়া চলিলেন।

কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ একদল লোক আসিয়া রামপ্রসাদকে ধরিয়া ফেলিল। বাক্যব্যয় না করিয়া ডাকাতেরা রামপ্রসাদকে তাহাদের আস্তানায় লইয়া গেল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই, কারণ রামপ্রসাদের মত সৌম্য-পুরুষ বহুদিন তাহাদের ভাগ্যে

জোটে নাই। নর-বলির ব্যবস্থা হইয়াছে আর কি ? সর্দারের আদেশে পূজার আয়োজন হইয়াছে। নর-বলি দিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহারা যাত্রা করিবে।

এদিকে রামপ্রসাদকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া স্নান করাইয়া আনা হইয়াছে, অপব দিকে "মায়ের পূজা" সমাপ্তির পথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার ভবলীলা শেষ হইবে কিন্তু রামপ্রসাদকে এতটুকু বিচলিত হইতে না দেখিয়া ডাকাতেরা স্তম্ভিত। এতদিন যাহাদের বলির জন্য ধরিয়া আনা হইয়াছে তাহারা কান্নাকাটি করিত, না হয় প্রাণভিক্ষার জন্য আর্তনাদ কবিত। যথা সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে রামপ্রসাদকে লইয়া যাওয়া হইল।

বলি দিবাব জন্য যেই খড়্গ তুলিল সেই মুহূর্তে রামপ্রসাদ গান ধরিলেন—

"তিলেক দাঁড়া ওবে শমন,<br>
মন ভরে মাকে ডাকি রে।<br>
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,<br>
আসেন কি না আসেন দেখি॥<br>
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'বে,<br>
তার একটা ভাবনা কি রে।<br>
তবে তারা নামের কবচমালা,<br>
বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥<br>
মহেশ্বরী আমার রাজা,<br>
আমি খাস তালুকের প্রজা,<br>
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,<br>
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥<br>
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা<br>
অন্যে কি জানিতে পারে।<br>
যার ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব।<br>
আমি অন্ত পাব কি রে॥

গানের সাথে সাথে মূর্তি কাঁপিয়া উঠিল। তখন রামপ্রসাদের চেহারা দেখিয়া কেহই আর খড়্গ হাতে লইতে সাহস পাইল না। অবশেষে সর্দারকেই আসিতে হইল, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হইয়া রাম-প্রসাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।*

সত্যরক্ষা হইবে না চিন্তা করিয়া রামপ্রসাদ যাত্রা করিলেন নবদ্বীপাধিপতির প্রাসাদেব অভিমুখে। এবার ডাকাত-সর্দার তাঁহার ভক্তে পরিণত হইল।

সাধক রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের সহিত এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না।

কিন্তু কালের গতি অবাধ্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-লীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। ৭৩ বৎসর বয়সে মায়ের গান করিতে করিতে মহারাজের প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল। মহারাজের তিরোধানের সাথে সাথে নবদ্বীপের খ্যাতিও লোপ পাইতে শুরু করিল। নদীয়ার ভাগ্যরবি পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইতে শুরু করিল।

তখন হইতে সাধক রামপ্রসাদের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। রামপ্রসাদের মনে পড়ে অতীতেব কথা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সাথে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের উৎস হইত কত কাহিনী, কত কথা, কত জিজ্ঞাসা একের পর এক ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আনন্দে গান গাহিয়া মহারাজকে কতভাবে সান্ত্বনা দিয়াছেন—

"এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা॥"

এই গানের সময়ে রামপ্রসাদের মত মহারাজও দিব্যভাবযুক্ত হইতেন। সেই মনের মানুষ আজ আর নাই। ব্যথায় তিনি জর্জরিত।

* একটি প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে।

বেশ কিছুদিন রামপ্রসাদের মন কষ্টে কাটিল। বিষাদের কালিমা. তাঁহার মনে কোন ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। সদানন্দ পুরুষ সকলের সহিত বেশ আনন্দ করিতে লাগিলেন। কত ভক্ত আসে আর যায়। সকলের সহিত সমভাবে আনন্দ উপভোগ করেন।

সাকার আর নিরাকারের দ্বন্দ্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু সাধক যখন সাধনার সর্ব শেষ স্তরে উঠিয়া যান তখন তাঁহার কাছে সাকার আর নিরাকার দুই সমান। প্রধানত রামপ্রসাদকে সাকারপন্থী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সাকার ও নিরাকার দুই-ই। তিনি যখন যে ভাবে তন্ময় হইতেন তখন সেই ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। তাইতো তিনি কখন শ্যামা মাকে স্থূলা, সূক্ষ্মা, সগুণা, নিগুণারূপিনী প্রভৃতি বলিয়া বিভিন্ন ভাবে আহ্বান করিয়াছেন, আবার কখন "নিরুপম-বেশ বিগলিত-কেশ, বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গা রণে" বলিয়া গান গাইতেন। আবার কখন একেবারে নিরাকার ভাবের গানও গাহিতেন—

"ওরে শত শত সত্য বেদ ভারা আমার নিরাকার
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥"

আবার কখন গাইতেন — ঃ

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি মন তাও জান না ?
কোন প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি।
গড়িয়ে করলি উপাসনা ॥"

সাধনার উচ্চস্তরে উঠিলে তখন আর কোন সবস্থা থাকে না, সব কিছুরই মীমাংসা হইয়া যায়, বিচারের আর অবকাশ থাকে না।

তখন 'তারা আমার নিরাকার' এবং 'এলোকেশী দিগ্বসনা'— এই দুই-ই সত্য, এক ও অভিন্ন।

প্রতি বৎসর ঘটা করিয়া সাধক রামপ্রসাদ দীপান্বিতা অমাবস্যায় আদ্যাশক্তির আরাধনা করিতেন। নানাবিধ আভরণ দ্বারা জগজ্জননী "মাকে" কত আদর করিয়া সাজাইতেন। সেই সাথে ঘোর অমানিশিতে বিবিধ গান রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখিবার জন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত।

এবারও দশভুজার পূজা শেষে, দীপান্বিতার অমানিশা সমাগতা। রামপ্রসাদ মায়ের পূজার জন্য ধীরে ধীরে আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু যতই দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, ততই রামপ্রসাদের হাবভাবে চাল-চলনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। কেমন যেন উদাসীন ভাব। কাহার সাথে তেমন একটা কথা বলেন না, দুই একটা কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মন ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যায়। তন্ময় ভাবে গান ধরেন—

"তারা—তরী লেগেছে ঘাটে,
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটিয়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি,
মনের গেরো দাওরে কেটে।
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো,
কি করবে আর ব'সে হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মন বাঁধ রে এঁটে-সেঁটে;
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়াবেড়ি কেটে॥"

মাতৃবিয়োগ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেহত্যাগের ব্যথা সামলাইতে তাঁহার বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থার সহিত তাহার তুলনা হয় না।

প্রতি বৎসরের মত এবারও দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথির পূর্বেই দলে দলে লোক আসিতে শুরু করে রামপ্রসাদের কালীপূজা দেখিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য এবং প্রাণ ভরিয়া মায়ের গান শুনিবার আকাঙ্ক্ষায়।

যথাসময়ে মায়ের পূজার লগ্ন উপস্থিত। পূজার যাবতীয় আয়োজনও প্রস্তুত। সাধক আসনে বসিয়া মায়ের পূজায় বিভোর। পূজার আসনে কী করুণ মিনতি, কী কাতর প্রার্থনা, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মায়ের নামগানে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। নূতন নূতন গানের সুমধুর সুর-লহরী অমানিশার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতে লাগিল—

"সামাল ভরে ডুবে তরী
তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি ডুবে মরি,
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই করছে দাগাদারি
এনেছিলে, বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে ভারী ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে, মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥"

পূজামণ্ডপে অপূর্ব ভাবের বন্যা বহিতে লাগিল। সেই ভাবে সবাই বিভোর। এ পূজা যে সাধারণ মন্ত্রের পূজা নয় এ যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের আকুল মিনতি আর প্রার্থনার পূজা। এইভাবে সারারাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিনও তাঁহার ভাবের কোন পরিবর্তন হইল না।

আহ্বানের পর বিসর্জন। প্রতি বৎসরের মত এবারও প্রতিমা

বিসর্জনের যাবতীয় আয়োজন করিলেন সাধক রামপ্রসাদ। মঙ্গলঘট মাথায় লইয়া সুমধুর মায়ের গান করিতে করিতে গঙ্গার দিকে চলিলেন রামপ্রসাদ। অপর সকলে প্রতিমা লইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

রামপ্রসাদ আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে গানের পর গান শুরু করিলেন—

"মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিনমজুরি নিত্য করি.
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেটে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না,
দিন তো আর গেল ঘেটে॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড,
পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি মত রতে চাই মা,
কর্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥"

* * *

"প্রমদ বলে মন দৃঢ়,
দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলে রফা
দক্ষিণা হয়েছে"

গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অপূর্ব জ্যোতিতে সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। "দক্ষিণা হয়েছে" মুখ হইতে নির্গত হইল, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু বাতাসে মিশিয়া গেল। পঞ্চভৌতিক দেহটি মাত্র প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।*

কুলকুলনাদিনী পতিতপাবনী পুণ্যতোয়া গঙ্গা সাধক রামপ্রসাদকে নিজের অঙ্কে তুলিয়া লইয়া কলকলনাদে ভক্তের এই অদ্ভুত মৃত্যু-সংবাদ চৌদিকে ঘোষণা করিলেন। যাহারা প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে আসিয়াছে তাহারা এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে অবাক হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ক্ষণপরে আত্মীয়-স্বজনের শোকার্তনাদে ভাগীরথী-কূল অকূলিত হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদের জীবননাট্যের যবনিকা পতন হইল।

রামপ্রসাদের ন্যায় সিদ্ধ-জীবন্মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি কুমারহট্ট ধন্য, ধন্য বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রামপ্রসাদের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ ও কবিকে পাইয়া চির-ধন্য হইয়াছে। যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে, বাঙ্গালীর কণ্ঠে সুর থাকিবে, বাঙ্গালী জাতি বাঁচিয়া থাকিবে, বাংলার আকাশে বাতাশে সংগীতলহরী খেলিয়া বেড়াইবে—ততদিন রামপ্রসাদের গীত বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তি-প্রেমের অমৃত-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া রামপ্রসাদের গৌরব প্রচার করিবে।

* রামপ্রসাদ যে কত বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন ৮০ বৎসর বয়সে, আবার কেহ কেহ বলেন ১০০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

অষ্টাদশ শতকে কুল, আচার ও সংস্কৃতির পরিচয় ছিল সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে, আবার নবাবী আমলে বৈষয়িক জীবনের জন্য প্রয়োজন ছিল ফারসী শিক্ষা।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র একই দেশে একই কাল ও খণ্ডে আবির্ভূত হলেও উভয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রামপ্রসাদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল ভারতচন্দ্র অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার জীবন সেই উত্তরাধিকার ও পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয় নাই। জীবিকার প্রয়োজনের জন্য কিছুদিন তাঁহাকে নগর-সমাজের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল পল্লী-প্রকৃতির লোকায়ত জীবনের সঙ্গে। সমসাময়িক নগর জীবনের ঐশ্বর্য-অলঙ্কার-সমৃদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে এই পল্লী আদর্শের বিশেষ যোগ ছিল না।

আবার ভারতচন্দ্র দরবারী সমাজের মধ্যে সেই পরিবেশসুলভ শিক্ষা-দীক্ষায় লালিত পালিত হইয়াছেন। সংস্কৃত পাণ্ডিত্য, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ-প্রিয়তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র একই কালে বাংলা সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সেই সমাজের ধারাকে ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সাহিত্যের মাধ্যমে।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুপ্রেরণায়। বিদ্যাসুন্দর আখ্যান ভাগ কাহারও নিজস্ব নয়। সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার সূত্রপাত। কে যে প্রথম বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন।

আমরা বর্তমানে বিদ্যাসুন্দরের অষ্টাদশ শতকের দুইজন কবি অর্থাৎ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য করিয়াছেন, কারণ কাব্যের শুরুতে দেবদেবীর বন্দনা আছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত, তাই তাহাতে পৃথক করিয়া কোন দেবদেবীর বন্দনা নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরামের "কালিকামঙ্গল" বা "বিদ্যাসুন্দর"-এর মধ্যে কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের অন্নদামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন থাকিয়া যায় - কোন কবি "বিদ্যাসুন্দর" প্রথম রচনা করেন? এই প্রশ্নটি লইয়া প্রচুর মতভেদ বর্তমান।

কিন্তু রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী রচনা একথা বলা চলে। একথা বলার কারণ রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বহুস্থানে "কবিরঞ্জন" কথাটিকে আপন নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামশরণং

নকল

পারশী নং ১০৩৪৮ [illegible]

১৫৮৩

"শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসী: প্রয়োজনঞ্চঃ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাই অতএব বেওয়ারিশ গরজমা জঙ্গল ভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলী শহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিশ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুণ শহর।—"

উপরের সনদটি হইতে জানিতে পারা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে যে ৫১ বিঘা মহাত্রাণ দান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে "কবিরঞ্জন" কথাটির কোন উল্লেখ নাই। এই মহাত্রাণ দানপত্রটি

১৭৫৯ সনে অনুষ্ঠিত হয়। তাহা হইতেই পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নবীন।

এবার আমরা কাব্যের বস্তুর আলোচনা করি, তাহা হইলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্য এইভাবে শুরু করিয়াছেন—বর্ধমানে রাজা বীরসিংহের কন্যা পণ করেন তাঁহাকে যে বিদ্যায় পরাজিত করিবে সেই তাঁহার পতি হইবে। কিন্তু কোন রাজপুত্রই তাঁহাকে ( বিদ্যাকে ) পরাস্ত করিতে পারিল না। তাই কন্যার বিবাহের জন্য রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। লোকমুখে শুনিতে পান, কাঞ্চীদেশে রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর 'বড় রূপগুণ যুক্ত', সে বিদ্যাকে বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারিবে। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাত এক ভাটকে পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ভাট আসিয়া সুন্দরকে পত্র দিল এবং ভাট সুন্দরের নিকট বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিল। ভাটের বর্ণনা শুনিয়া—

> "বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
> বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥
> হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
> কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব ॥"

এই অবস্থার পরই ঠিক হইল সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা—

> "একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
> যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।"

এইবার সুন্দর কালীর আরাধনা শুরু করিল, দেবী আকাশ-বাণীতে বলিলেন—

> "চল বাছা বর্ধমান বিদ্যালাভ হইবে।"

সুন্দর "বিদ্যা" লাভের জন্য বর্ধমান যাত্রা করিল।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের বর্ণনা একটু ভিন্ন ঃ

রাজা বীরসিংহ কন্যার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পাত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, নিকটেই মাধবভাট থাকিত। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে, সে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান আনিয়া দিতে পারে একথা রাজাকে জানাইল। রাজা বীরসিংহ তাঁহাকে শিরোপা করিলেন, উপহার দিলেন নানা রত্ন ও একটি তাজা ঘোড়া। এইবার রাজা বীরসিংহ কন্যার উপযুক্ত বর মিলিবে এই আশায় নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। ভাটের রাজকন্যার পতি অন্বেষণের বর্ণনা এইরূপ—

"মাধব তুরঙ্গ চাপে গোঁফে পাক দিয়া চাপে
সেটো মারে পিছাড়ে চাবুক।"

* * *

ভ্রমিল অনেক ঠাঁই উপযুক্ত মিলে নাই
শেষ কাঞ্চীদেশে উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়ার সঙ্গে সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত।
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত।"

তাহার পর "বাবুজি কুর্নিশ" করিয়া মাধবভাট নিজ পরিচয় দিয়া হিন্দীতে বলিল—

'চিন্‌লিয়ে দেওকে এঁয় সে আপকে সুরত যেয়্‌সে
দুনিয়ামে পয়দা কিয়া যোহি।
দেখাহোঁ মুলুক কেত্তা ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি।।'
বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয় বড়া তাজা
শোন্ হোঁগে ওনকা জেকের।

ওন্‌কা ঘরমে লেড়কী  এক তারিফ করেঁা মে কেতেক
রাত দেন সাদিকা ফেকের ॥
কওল এতনা কি হেয়ও  হজি-মৎ হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাম।
তোমরা হোঁ এসা জানঁ  সো কহোঁ যো কহা মান,
তোম সকোগে তাও হামারে সাথ॥'

ভাটের নিকট হইতে সুন্দর বিদ্যার সম্বন্ধে সকল বিষয় শুনিয়া লইল। রাত্রিশেষে কালী তাহাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, ভবিষ্যৎ কি হইবে মোটামুটি জানাইয়া দিলেন। প্রভাতে সুন্দর বর্ধমান যাত্রা করিলেন। রামপ্রসাদ সব কিছুতেই একটু বেশী বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন।

রামপ্রসাদকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের লোক বলা যায়। রাজধানী, রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় তিনি বাস্তব চিত্র তেমন অঙ্কন করিতে পারেন নাই। পাত্র-পাত্রী ও নায়ক-নায়িকা বর্ণনায় তিনি একান্ত সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের চিত্রই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কাহিনীতে নায়ক-নায়িকাগণে রাজধানী বা রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবাধ গতিবিধি পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতচন্দ্র মোঘল রাজত্বের শেষ অবস্থার জমিদার পরিবারের সন্তান। সেই সময়কার রাজকীয় আভিজাত্যের সহিত ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তাই তাঁহার কাব্যে রামপ্রসাদের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক রাজকীয় আভিজাত্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের "সুন্দরের" ভাবভঙ্গীর মধ্যে পূর্ণ আভিজাত্য বিদ্যমান। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন পর্বে ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় যে আভিজাত্য-জনোচিত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল রামপ্রসাদের বর্ণনায় সেই রূপ আভিজাত্য ফুটিয়া ওঠে নাই।

বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদের জীবনের সর্বপ্রথম রচনা বলা চলে। ইহার মধ্যে প্রসাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের সহজ প্রকাশ নাই বলিলেই চলে।

# বিদ্যাসুন্দর

## রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বিরচিত

### অথ গণেশ বন্দনা

পরম পুরুষ প্রভু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণ-বদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্ময় তনু
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত মণি হেম মরকত
সিন্দুরে সুন্দর শুণ্ড গণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গ-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু পৃষ্ঠ
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম
যায় তায় করি অধিকার॥
দেব দেব দীনবন্ধু দাসে দেহি দয়াসিন্ধু
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্মে তুমি মূল হও শীঘ্র অনুকূল
আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার॥
রাম রাম সেন নাম মহা কবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ-পদে
কিঞ্চিত কটাক্ষে কর দয়া॥

## অথ সরস্বতী বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী ভুবনমোহন ভঙ্গী
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ড জননী॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ হংসবধূ অনুক্ষণ
হৃদি মধ্যে বিরহ মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা পাল মাতা নিজ আজ্ঞা
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মান আলাপে মোহিত জ্ঞান
রাগ ছয় ছত্রিশ রাগিনী।
ন বিদ্যা সঙ্গীত-পর যে গানে ত্রিপুরহর
দ্রব্য কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা নির্মল সুতুঙ্গ ভঙ্গা
কণামাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈবল্য মুক্তি
স্নানফল কহিবে কি নরে॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয় মহাকবি মহাশয়
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান।
বহু কষ্টে চিত্তে খেদ সঙ্কলন করি বেদ
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম জীয়া তারে কি বা কাম
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য॥

তুমি বিশ্ব-অন্তর্যামী স্তব কিবা জানি আমি
বেদাগমে-অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা স্মর হর হরি ধাতা
কোনরূপে না পাইলা সীমা॥

### অথ লক্ষ্মী বন্দনা

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর।
কমলচরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর॥
গুরু-উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ॥
কান্তিমধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্মকোক।
তব রোমাবলী কুচকুম্ভ কহে লোক॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তণু॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর।
পূর্ণচন্দ্র-শোভা যেন পিবতি চকোর॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দণ্ডশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্ত মনোলোভা॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিত কিঞ্চিত॥
নিন্দিয়া গিধিনি শ্রুতি শ্রবণযুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥

সর্বগুণহীন যদি ধনবান হয়।
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ত্বদানে বিত্ত-গুণে সে লভে সাযুজ্য॥
সে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম পূর্ব ধর্ম লোপ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রী-পুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সর্ব তোমার মায়া জানি গো জননী
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী॥

## অথ কালী বন্দনা

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ইকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই॥
রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি গজ-পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥
নাম নিত্য নৃত্যাতি নিখিলনাথ উরে।
বিপরীত কাজ লাজ পরিহারি দূরে॥

কাদম্বিনী জিনিয়া নির্মল বর্ণ কালো।
কলেবর কিরণ তিমিরপুঞ্জ আলো ॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল্ ॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পমান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে ॥
বিবস্ত্রা যোগিনী ঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে ॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপছটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্ধ্বমুখে গিলে রিপুঘটা ॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর ॥
একান্ত কাতর অতি মহি যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল ॥
অখিলজননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥
অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম ॥

বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্যকর্তা যশ ॥
স্বকীয় সুন্দরী-পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রাপ্ত মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি ॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধভয়।
চর কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥
চন্দ্র সূর্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুহ শত্রু নিরীক্ষণে ॥
সতী সঙ্গি সভক্তি হৃদয়পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মৃত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ ॥
মহাভীতা ধরনী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়তি কোন রূপে নাই পরিত্রাণ ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিখ-হীন বিগত বিষাদ ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদ গদ ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

## জাগরণারম্ভ

### বিগ্তার পাত্রান্বেষণে

#### মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিন্তিত অতি
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে
বিশেষত বিগ্যালাপে জই॥
সে জন তাহার প্রভু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কভু
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
শত শত ভূপ-সুত রূপেতে বটে অদ্ভুত
বিগ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয় এ কথা অন্যথা নয়
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র॥
ভাট বাক্যে অট্টহাসে সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে
শিরপা করিলা ত্যজি ঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার নানা রত্ন দিলা আর
খাস পোষাকের খাসা ঘোড়া॥
বিদায় করিলা ভাটে পুনরপি রাজপাটে
রাজকর্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর
মনে মনে জানিলা স্বরূপ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে গোঁপে পাক দিয়া চাপে
সেট্যে মারে পিছাড়ে চাবুক।

পবন-গমনে যায়　　　　পাছু পানে নাহি চায়
প্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই　　　　উপযুক্ত মিলে নাই
শেষ কাঞ্চীদেশে উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে　　　　সুকবি সুন্দর রঙ্গে
রূপ দেখে ভট্ট হরষিত ॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি　　　　যে যে কহে দৃঢ় কোটি
ক্ষণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড়　　　　ভবানীর ভক্ত বড়
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥
চিত্তে চমৎকার লাগে　　　　করযোড়ে খাড়া আগে
রায়বার পড়্যা করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত　　　　কহিতেছে হিন্দি বাত
শুনে সুখী সুন্দর নীরব ॥
বাবুজি কুর্নিস মেরা　　　　বধ মান বিচ য়েঁাড়া
নামে তো হামারা মাধেঁ ভাট।
আরজ করেঁাগে পিছে　　　　ঘড়ী এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট ॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়া　　　　তস্ দিয়া পায়া হোঁ বড়া
ওলেকেন্ ভুল গেয়া সব।
খেলাফ না কহোঁ বাবু　　　　তোম্নে মুঝে কিয়া কাবু
মেঁই রোই তুঝে দেখা যব ॥
চিন্ লিয়ে দেওকে এয়্সে　　　　আপকে সুরত যেয়সে
দুনিয়ামে পয়্দা কিয়া সোহি।
দেখাহোঁ মুলুক কেত্তা　　　　ছাত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি ॥

বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হেয়্ বড় তাজা
শোন হোঁগে ওনকা জেকের।
ওনক্ ঘরমে লেড়কী এক তারিফ করোঁ মে কেত্তেক
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্না কি হেয়ও হাজিমত হি দেগায়েও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্কা নাথ।
তোমরা হোঁ এসা জান যো কহোঁ সো কহা মান
তোম সকোগে তাও হামারে সাথ॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া সুন্দর সুস্থির হৈয়া
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যা নাম সুধা সুন্দরের গেল ক্ষুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন॥
ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥
প্রথমেতে গুপ্ত কাজ ব্যক্ত শেষে মহারাজ
কোটালে কহিবে কটিবারে।
সে কিছু মানস নয় কেবল দর্শাবে ভয়
পরিচয় লইবার তরে॥
সন্ধান করিবে পুন কারণ ইহার শুন
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ।

কাকী যাইবা তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ ॥
দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন
স্বস্থানে প্রধান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় রজনী প্রভাত হয়
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা ॥

## বাজার বর্ণনা

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥
বাণিজি দোকান কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥
বনাত মখ্‌মল্‌ পটু ভূষণাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা ॥
মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফা মজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥

ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুইপাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোক যত করিছে সেলাম॥
আগে ডঙ্কা সন্তারি সন্তারি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্পা ভেঁওরি বিষাণ॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত।
পাছে যাবে বুঝা পড়া বাহাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

**অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত**

অদূরে উদয় রবি নিদ্রা তেজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম পূর্ণহেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধূতি পরি
সসঙ্কল্প গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় দুঃখ।
সে জন গমনে কুসুম-কাননে
বিকশিত হয় পুষ্প॥

কাঞ্চন কস্তুরী বক অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা কুন্দ সেফালিকা
কেতকী বর্ণে কনক ॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন কদম্ব মঞ্জন
কামিনীনয়নশূল ॥
সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ শ্মরে দহে প্রাণ
চমকিয়া হীরা উঠে ॥
গতি গজ জিনি মন্দ হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত ভ্রমর গুঞ্জিত
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥
ভ্রমিতে কানন-মাঝ সম্মুখে যুবরাজ।
পুটাঞ্জলি পাণি মুখে মৃদু বাণ
কহে তব এই কাজ ॥
সামান্য পুরুষ নহ স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি নবরূপ ধরি
কি হেতু তুমি ভ্রমহ ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয় ধন্য মমালয়
অতিথি শ্রীনরোত্তম ॥
গুণরাশি কহে হাসি একথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই সাপরাধি হই
তুমি গো ধর্মত মাসী ॥
হীরাবতী মনে হাসে সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে কবি কুতূহলে
চলিল মালিনী-বাসে ॥

## মালিনীর হাট পরিচয়

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুক করে বাঁকা॥
ছাটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিক দ্রব্য থোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজ্‌রার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি আসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥

টাকা সিকা কোন্ বস্তু কত কাল খাব।
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব ॥
পূর্বজন্ম-পাপে এত পরিতাপ পাই।
তুকূলে এমন নাই তার মুক চাই ॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন ॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা তুটা ॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ফাঁকি দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা ॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর ॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় তুখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুখায়েছে মুখ ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি ॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাঝি।
প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষা কর আজি ॥

## পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

মনে বড় ভয় না জানি কি হয়
গগনে উঠ্যাছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা আছে কোপযুতা
কহিবে করিল হেলা ॥

যা করেন শিবা আর চারা কিবা
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই ত্বরা করি সেই
চলিল বিদ্যার ঠাঁই ॥
দাঁড়াইল আগে সতী কহে রাগে
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান করি সমাধান
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা ॥
ভুলিলা সে কাল এবে ঠাকুরাল
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে পথ যাও হেঁটে
ঠাহরে না পড়ে পা ॥
তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই
এ পাপ-চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার জানি প্রতিকার
যেমন তোমার কাজ ॥
ভূমে সাঝি রাখি ছল ছল আঁখি
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ বচন নিগ্রহ
বিগ্রহ আমার দহে ॥
ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ
এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী চিত্তে এই বাসি
ক্ষমহ বাড়া কি কব ॥
এতেক বলিয়া চলিল কান্দিয়া
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে শ্রীপ্রসাদ বলে
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে ॥

## মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা

স্নান করি বিধুমুখী' হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকন গাঁথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা কার
ধ্যান জ্ঞান দুই গেল দূরে।
কহে ডাকি সুলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণা
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই
দরশন পাইব কি রূপে।
তিলেক বৎসর প্রায় বুকে ফেটে জিউ যায়
সখী প্রতি কহে চুপে চুপে॥
হেদে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোষ
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই বুঝি বা তেমন নাই
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা প্রসন্না হইয়া শ্যামা
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য হও আজিকার দিন রও
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।

এতই কেন উন্মত্ত মিলিবে সকল তত্ত্ব
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥
বিদ্যা বলে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিত্রাণ
সবশেষে যত দেও গালি ॥
বুঝি হারা পুন তারা কহে সারা হও পারা
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥
ভয় দর্শাইয়া নানা জনে জনে করে মানা
কষ্টেশ্রেষ্ঠে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উথলিলে
বালির বন্ধন কোথা থাকে ॥

## মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়

যথোচিত মনোভঙ্গ দুঃখানলে দহে অঙ্গ
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে পাছু দিয়া ঢোকে ঘরে
অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥
কুহরে কোকিল কুল ফুটে বনে নানা ফুল
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতিনন্দিনী যথা লঘুগতি চলে তথা
বলে লও নৃপতির বালা ॥

রাখি হার পরিহার করে করে ধরি তার,
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ বুড়ি নও বুদ্ধি লোপ
মমতা সকল গেল দূর ॥
আদ্যোপান্ত এই ধারা ক্রোধে হই জ্ঞানহারা
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্যকে ডরান পিতা ততোধিক মাতা ভীতা
জান না গো তুমি কি আমাকে ॥
সহস্র মাথার কিরা ওগো হীরা চাও ফির্যা
বুক চির্যা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান পুরুষরতন আন
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে ॥
হীরা কহে করি ছল ভাল পাইলাম ফল
বাকি বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য মোকে হাসে লোকে কহে তোকে
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা বট ধন্যা এত অন্যাসনা
করিয়াছ কিবা কাজ।
রসমই শুন কই যুবা নই বৃদ্ধ হই
একা রই আই মা কি লাজ ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা
কহ কি শুনিলা আর ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী ভব্যতা তোমার জানি
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥
পুন রামা কহে ভাষ ছাড় হীরা পরিহাস
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে মিথ্যা নহে দেহ দহে
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥

## কবির সুড়ঙ্গ পথে গমনোদ্যোগ

বিজ্ঞবর বরাবর বিবর বিশিষ্ট।
হ্রীরূপিনী হ্রীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট ॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল ॥
মোহন মকরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া।
উথলে আমিয়া-সিন্ধু উল্লসিত হিয়া ॥
যামিনী যামার্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গছবি ॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে ॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই ॥

## মায়ের বাল্যলীলা দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণীর বিমোহিত হওন

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনকা গিরি
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পূণ্যতরুফল সেই মন্দিরে প্রকাশ এই
দোঁহে ভালে আনন্দ-সাগরে॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু সুললিত-লোচন সজল
হরল মুখে বাণী॥
ঘেরল অবল সবহু রমণী মুখমণ্ডল
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল বিলম্বিত ঝলমল
কো বিধি দেওল আনি॥
হিমকর বদন বদন মুকুতা বলি
করতল কিসলয় কমলপাণি।
রাজিত তহি কনকমণি ভূষণ,
দিনকর ধাম চরণতলখানি॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদ বলে সেই ব্রহ্মময়ী
জগজন মন বিকচকর তাহি পাণি॥

## মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা

পূজে ঝঞ্চা বৃষকেতু পুষ্প চয়ন হেতু
উপনীত কুসুম-কাননে গো—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমাতা।

নানা ফুল তুলি          চিত্তে কুতূহলী
-গমন কুঞ্জর গমনে ।।
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী          প্রেমানন্দে গৌরী
স্নান মন্দাকিনী-জলে ।
হেরিব তোমার যে          কপালে চাঁদের আলো
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভালো ।
অঙ্গে কৌষেয়-বসন সাজে,
দেখ আমার বুকে যেন শেল বাজে.
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী-বিল্বদলে ।।

**মেনকা গৌরীকে গৃহে আনিতে কহিতেছেন**

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে ।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ
কেমনে কেমন কেমন করে ।।
দুটি আঁখি পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ ।
প্রেমানন্দ-সিন্ধু          তার পূর্ণ ইন্দু
মন গজেন্দ্র আলান ।।
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা
ত্রিভুবন সারা পরা গো ধন্যা ।
কি পুণ্য করেছি          উদরে ধরেছি
ত্রিগুণধারিনীকন্যা ।।
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো          তবে বাছা
এই কথা রাখ মার ।
গিরিরাজ কুমারী          ভৈরবীর বেশ ছাড়ি
ব্রহ্মচারিণীর আচার ।।
কবি রামপ্রসাদ দাস গো          ভাবে জননী
মা কত কাচ গো কাচ ।
তুমি পিতা মহেশমাতা     পিতার প্রসবস্থলী মাতা
মহেশঘরে আছ ।।

## ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও শিববিচ্ছেদ জন্য খেদোক্তি

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা।
পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥
মত্ত কোকিল কুজতি পঞ্চস্বরে।
গুণ গুণ গুঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥
তরু পল্লবশোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠিল চারু কদম্বমূলে ॥
মুখমণ্ডলে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ শুধাংশু পীযূষ ঘরে ॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিবশঙ্করি শঙ্কর গান করে ॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে ॥
তব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাসুর গর্ব বিনাশকর ॥
জয় বেদ বিদাম্বর ভূত পতে।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্বগতে ॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলী গান সুখে ॥
সুর শৈবলিনী জলে পূত জটা।
জটালম্বিত চারু সুধাংশুচ্ছটা ॥
জটা ব্রহ্মাকটাহ তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ হে প্রভু হে ॥
ভব ভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে।
ভব ভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥

## শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

### আগমনী ও বিজয়া

(১)

রাগিনী—মালসী

আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার
এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী
বসন না সংবরে।
গদগদ ভাবভরে ঝর ঝর আখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে,
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাসরে ॥

(২)

রাগিনী -- ললিত

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে আসে মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার ॥
তব দেহ পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদায় ॥
তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ॥
প্রসাদের এই বাণী হিমগিরি রাজরাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার ॥

# পদাবলী

## প্রসাদী সুর

### একতালা

(১)

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই।
মন যে তুই আমার ছিলি ॥
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইরে,
শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরু দত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেমনি গেলি তেমনি গেলাম
করে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালি ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছে,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি গেঁথে রেখেছি,
হৃদয়ে দক্ষিণা কালী ॥

(২)

## প্রসাদী সুর—একতালা

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এমনি কাজের ধারা।
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীত লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে
মানব-ঘরে ফেরা ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা,
এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্তা যে জন, স্থির নহে মন,
দু'জনেতে কল্লে সারা ॥

---

(৩)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা-ওয়াশীল দাখিল আছে
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে ॥

জন্মজন্মান্তরে যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল,
কর্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশি
তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে ॥

(৪)

## প্রসাদী সুর—একতাল।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে,
নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে,
বিশ্বেশ্বররাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে
নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥

(৫)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মন তুমি কি রঙ্গে আছ,
ও মন রঙ্গে আছ বঙ্গে আছ।
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুরে নাচ ॥

রঙের বেলা রঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ ॥
ও মন দুঃখের বেলা রতন মানিক,
মাটির দরে তাই বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥

(৬)

## প্রসাদী সুর— একতালা

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক, হয় আর,
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত ॥
ও মা ষড়্‌রিপু সাহায্যে তায়
হোলে ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব-সংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত!
ও মা যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে
ঘুচলো নাকো মুখের তিত।
কোন ভিষক্ প্রসাদ, মনে বিষাদ
হয়ে কালীর শরণাগত ॥

(৭)

## প্রসাদী সুর—একতালা

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি,
জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তায় কাচ না।
খেয়েছ বিষয় মদ,
সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ॥
আজ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই,
ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা-ঘুম আসিবে,
ডাকলে আর চেতন পাবে না ॥

(৮)

## প্রসাদী সুর · একতালা

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী, তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি,
কহিতে মনে বাসি ভয়,
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য-বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে,
যোগ-ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য-উদয় ॥

(৯)

## প্রসাদী সুর—একতালা

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণভয়ে ॥

———

(১০)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মা আমার খেলান হলো।

খেলা হলো গো আনন্দময়ী ॥

তবে এলেন কর্তে খেলা, করিলাম ধূলাখেলা,

খন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,

কাল যে নিকটে এলো।

বাল্যকালে কত খেলা,

মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো

পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়

আজপা ফুরায়ে গেলো ॥

প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্তি কি করি বল।

ওমা, শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া

মুক্তি-জালে টেনে ফেলো ॥

(১১)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মন গরিবের কি দোষ আছে।

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,

যেমনি নাচাও, তেমনি নাচে ॥

তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম, মর্মকথা বুঝা গেছে।

ওম', তুমি ক্ষিতি তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি
তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ
চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে কর্ম সূত্র,
সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়া-সূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা-ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥

(১২)

প্রসাদী সুর—একতালা

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত—
জীর্ণ তরী তুফান ভারি
বাইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার একাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
এনেছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন,
তখন তহবিলে হবে হারি ॥

দীন রামপ্রসাদ বলে মন,
নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি॥

---

(১৩)

**প্রসাদী সুর—একতালা**

ওমা, তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে
রেখেছ সব পাগল ক'রে॥
মায়া-ভরে এ সংসারে,
কেহ কারে চিনিতে নারে
ঐ যে এমনি কালীর কাপ আছে যে,
যেমনি দেখে তেমনি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক-ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যাই অনুগ্রহ করে॥

---

(১৪)

**প্রসাদী সুর—একতালা**

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাইরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে,
উপবাসী হ'য়ে পড়ে রব॥

প্রসাদ বলে, উমা আমার,
বিদায় দিলেও নাই কো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব।

---

(১৫)

## প্রসাদী সুর—একতালা

এলাকেশী দিগ্বসনা।
কালী পূরাও মোর মনোবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমার হবে কি না হবে দয়া,
ব'লে দে মা ঠিক-ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে,
বলেছি মা তোমার কাছে,
ওমা, তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না॥

---

(১৬)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মরি গো এই মনোদুঃখে।
ওমা, মা-বিনে দুঃখ বলব কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভকে॥
সে কি তোমার সাধের মা,
রাখলে যারে পরম সুখে।

ওমা, আমি কত অপরাধী,
মুন মেলে না আমার শাকে ॥
ডেকে ডেকে কোলে ল'য়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে ॥

---

(১৭)

**প্রসাদী সুর—একতালা**

পূরলো নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রইল মনে ॥
দুঃখে দুঃখে কাটালেম,
সুখের আর কিসে ভরসা।
আমি বলব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্মনাশা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উল্টা দশা ॥

(১৮)

**পিলু—বাহার—যৎ**

মা ব'লে ডাকিস না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই,
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই ॥

---

(১৯)

## মুলতানী—একতালা

জননি ! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে
কৃপাবলোকনে তারিণী ।
তপন-তনয়-ভবভয় বারিণী ॥
প্রণবরূপিনী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
ভব-পারাবার-তারিণী ।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা হীনমূলা
মূলাধার-অমল-কমল বাসিনী ॥
আগম-নিগমাতীত খিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতি-রূপিণী ।
হংসরূপে সর্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি ত্রিধাকারিণী ॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি ॥

(২০)

## মুলতানী—ধানশ্রী—একতালা

করুণাময়ি ! কে বলে তোরে দয়াময়ী ।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা ( গো তারা )
আমার অমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ
কারে দিলে ধন-জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ।

কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
মাগো, আমি কি তোর পাকা
ক্ষেতে দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
আমার কপাল বুঝি অমনি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী ॥

---

( ২১ )

**প্রসাদী সুর—একতালা**

পতিতপাবনী পরা,
পরামৃত ফলদায়িনী।
স্থ-দীনে চরণছায়া, বিতর শঙ্কর-জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা নিস্তারকারিণী ॥
কৃতপাপ হীনপুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারা রূপে তারয় মাং, নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণবে চরণ-তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্ন ভব ভবের গৃহিণী ॥

---

(২২)

**জংলা—খয়রা**

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে—
পৃথক প্রণব নানা লীলা তবু,
কে বুঝে একথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী;
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী
এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥

আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস
এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্বে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারী।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি ॥

(২৩)

## খট-ভৈরব—একতালা

তোমার সাথী কে রে ( ও মন )।
তুমি কার আশায় বসেছ রে ( মন ) ॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে
যা রে যা রে গুরুর নামে
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যা রে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে
সোজা হয়ে চল রে।
নইলে আঁধারের কুটীরের গৌত,
যোগে লেগেছে রে ॥

---

(২৪)

**প্রসাদী সুর—একতালা**

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নামটি সারা॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙে শাপ দিল,
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য কারণ তোমার নাই,
ওয়ায় সয় তর বয় সেইরূপ বর্ণ পার্রা॥
দশের লাঠি একের বোঝা,
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষুধারা
পাগল বেটার কথায় মজে,
এত কাল মলাম ভজে,
দিয়াছি গোলামী খৎ
এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা কার খৎ,
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
তারায় লুকোয় তারা॥

(২৫)

## সোহিনী—একতালা

দেখি মা কেমন ক'রে

আমারে ছাড়ায়ে যাবা ॥

ছেলের হাতের কলা নয় মা,

ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥

এমন ছাপান ছাপাইব মা গো,

খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।

বৎস-পাছে গাভী যেমন,

তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥

প্রসাদ বলে ফাঁকিঝুঁকি মা গো,

দিতে পার পেলে হারা।

আমায় যদি না তরাও মা,

শিব হবে তোমার বাবা ॥

(২৬)

## প্রসাদী সুর—একতালা

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা

ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥

চেনে না আমারে শমন,

চিনলে পরে হবে সোজা।

আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বই রে বোঝা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে,
নাই মহালে শুকা হাজা ॥
দেখ বালিচাপা সিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে, যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সেই পদের মজা ॥

(২৭)

## প্রসাদী সুর—একতালা

তুই যা রে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি,
মনবেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে
হৃদ-গারদে বসায়েছি ॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ স'পেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা,
পলাইতে নাইকো ফায়দা,
হামেশা রুজু ভক্তি প্যায়দা,
দু'নয়ন দারোয়ান দিয়েছি ॥

মহাজ্বর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি,
তাই সর্বজ্বরহর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী ব'লে
যাত্রা করে বসে আছি ॥

(২৮)

## প্রসাদী সুর—একতালা

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥
বল গে যা তোর যম রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥

(২৯)

## প্রসাদী সুর—একতালা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমনভয় রেখেছি ॥
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গা নাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারা নাম,
আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে
যাত্রা ক'রে বসে আছি ॥

(৩০)

## পিলু—বাহার—যৎ

ওরে মন, বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র, কর দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে

যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥

( ৩১ )

**প্রসাদী সুর—একতালা**

মা গো, আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে আনন্দময়ী,
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী।
নইলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি'।
না করিলাম ধর্মকর্ম
পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে
পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জনমি ভারতভূমে মা।
কি কর্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দু'কূল গেল,
অকূল পাথারে ভাসি ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে
দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥
পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসিখুশী
সদাই যখন করে রোদন
প্রসাদ নয়নজলে ভাসি ॥

(৩২)

## প্রসাদী সুর—একতালা

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে।
তারা নামে পাল খাটায়ে ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দে রে কেটে ॥
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল
কি করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এ টেসে টে
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়াবেড়ি কেটে ॥

## সিন্ধু—ঠুংরী

(৩৩)

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা ॥

(৩৪)

## প্রসাদী সুর—একতালা

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা-মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য-খুঁটা ধ'রে রবি ॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞান-সিন্ধু মাকে ডুবাইবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে,
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি ॥

(৩৫)

### প্রসাদী সুর—একতালা

মন রে, শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধন-মদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেতে নৈরাশ কব, কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা,
দূর ছাই ক'রে ক'রে হাঁক॥

(৩৬)

### প্রসাদী সুর—একতালা

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে তাই কি জান না
ওরে, কেমন দিতে চাস বলি
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥

(৩৭)

**জংলা—একতালা**

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি॥
আমার দু-আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী।
বিষয়বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি॥
আমায় যা বলে বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী।

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে
অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥

(৩৮)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ ক'রে
পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি,
দিনের সুদিন যেটা।
ওরে, শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হও রে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছে পাখী আটক করবে কেটা ॥
ওরে, জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী ধিঙ্গি ধিঙ্গি দুটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জান তো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি
বুঝাইব সেটা ॥

(৩৯)

## প্রসাদী সুর—একতালা

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদ্‌ছে তোর ধন বিহনে ॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ।
রাখি হৃদি পদ্মাসনে ॥
গুরু আমার কৃপা ক'রে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে
তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয়দুর্গা ব'লে
স্থান নাই যেন ঐ চরণে ॥

(৪০)

## প্রসাদী সুর—একতালা

দীন-দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ তোমার
পতিত তনয় ডুবল ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো
কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা,
নইলে খালাস কর ভবে ॥

ডাকি পুনঃ পুনঃ, শুনিয়া না শুন,
পিতৃ-ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে
শরণ নিবার কাজ কি তবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর
ক্ষতি কিছু না হবে।
মা, তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥

(৪১)

ইমন—একতালা

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তত্বরসি বিগলিতকেশী ॥
সেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘুষি ॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী ॥
মায়ের করুণা বরুণা ধারা অসিধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি।
পরে তত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী ॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছ আমার
কালী মায়ের ফাঁসি ॥

## (৪২)

### ললিত-খাম্বাজ—একতালা

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
মন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপৎকালে ব্রহ্মময়ী,
আসেন কিনা আসেন দেখি রে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে
তার একটা ভাবনা কি রে
তবে তারা-নামের কবচমালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান
কখন বাকির দায়ে না ঠেকি রে।
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা
অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কি রে ॥

## (৪৩)

### গাড়া—ভৈরব—ষৎ

ভেবে দেখ্ মন কেউ কার নয়
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্তা বলে সবাই বলে ॥

আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্তা এলে ॥
যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে ব'লে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে ॥

(৪৪)

জয়জয়ন্তী—যৎ

এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী ;
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দী
তালুক হয় না লাটে বন্দী, মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা।
দিতে হয় না মাথট বাটা, মা,
জয়দুর্গা নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

— ——

(৪৫)

### জয়জয়ন্তী—একতালা

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে
আমাকে দিতেছ ফঁাকি॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে, মন,
ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে,
অরি সুখে হইলি সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম, মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ
একবার শ্যামা বল রে দেখি॥

(৪৬)

### প্রসাদী সুর—একতালা

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।
প্রসাদ বলে কি ফল হবে
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধ'রে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

(৪৭)

## প্রসাদীসুর—একতালা

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিব যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে॥

(৪৮)

## প্রসাদী সুর—একতালা

মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত॥

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমার,
ছ'টা কলুর অনুগত ॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি,
পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ,
যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত :
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত
রামপ্রসাদের এই আশা, মা,
অন্তে থাকি পদানত ॥

(৪৯)

**একতালা**

মন রে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন্ রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।

সে যে মুক্তকেশীর ( মন রে আমার ) শক্ত বেড়া,

তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥

অদ্য অব্দ শতান্তে বাজেয়াপ্ত হবে জান না ।

এখন আপন ভেবে, ( মন রে আমার ) যতন করে

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥

গুরু রোপণ করেছেন বীজ,

ভক্তিবারি তাই সেঁচ না ।

ওরে, একা যদি ( মন রে আমার )

না পারিস মন ।

রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥

(৫০)

## প্রসাদী সুর—একতালা

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা ॥

নমস্তুতে কর্ম্মভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা

আমি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে

দূর করিব মনের ব্যথা ॥

তুমি গো পাষাণের সুতা,

আমার যেমনি পিতা তেমনি মাতা ।

রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে,

গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥

(৫১)

## প্রসাদী সুর -একতালা

ভবে আশা খেলব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা
প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো॥
নোব রে আধার ষোল যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষ কবে পার পেয়ে মা গো,
পাঞ্জা ছক্কার বন্ধ হলো॥
ছ দুই আট দু চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ,
একার বাজী ভোর হইল।
দুন্ধ হলো চোদ্দ পোয়া বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এল

(৫২)

## প্রসাদী সুর—একতালা

এবার কালী তোমায় খাব;
( খাব খাব গো দীন দয়াময়ি )
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে,
সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই, মা,
দুইটার একটা করে যাব॥

ডাকিনী যোগিনী দুটা,
তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে
অম্বলে সম্বরা দিব।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালি মাখিব,
যখন আসবে শমন, বাঁধবে কষে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানি সে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে,
কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে,
কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ।
ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥

(৫৩)

## বেহাগ—আড়খেমটা

আমার কপালি গো তারা।
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা, কোন কালে।
শিশুকালে পিতা ম'লো,
মাগো, রাজ্য নিলো পরে,
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে ॥

স্রোতের শেহালার মত
মা গো, ফিরিতেছি ভেসে ভেসে,
সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মা গো, আর দিব আমার মাথা,
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে ।।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোনো গো মা নারায়ণী
তনু অন্তকালে আমায়
টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ।।

(৫৪)

মন কেন মার চরণ ছাড়া ।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ।
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া ।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে ;
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ।।
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে,
মোলে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবরছড়া ।।
ভাই বন্ধু দারা সুত,
কেবল মাত্র মায়ের গোড়া ।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ।।

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোসর বস্ত্র গায় দিবে চারকোণা,
মাঝখানে ফাড়া ।।
সেই ধ্যানে এক মনে,
সেই পাবে কালিকা তারা ।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ।।

(৫৫)

হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা ।
মন পবনে দুলাইতেছে দিবস রজনী ওমা ।।
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহনায়, হেরিলে অমনি ও মা
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের সেই বোল,
ঢোল মারা বাণী ও মা ।।

(৫৬)

অপার সংসার, নাহি পারাবার ।
ভরসা শ্রীপদ সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী,
করগো নিস্তার ।।

যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার ॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম,
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার
কাল গেল কালী হ'ল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন,
এ ভব-বন্ধন কর বিমোচন,
মা বিনে তারিনী কারে দিব ভার ॥

(৫৭)

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভাল যদি থাকবে আমার
মন কেন কুপথে চলে ॥
হেদে গো মা দশভুজা,
আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা
জবা বিল্ব গঙ্গাজলে ॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
তখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকব কালী কালী বলে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর বলে,
কে ধরে তুলিবে কূলে ॥

(৫৮)

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে, উন্মত্ত আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধরতে পারে ॥
মনে অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তিসারে,
পরে কোটার ভিতর চোর কুঠরি,
ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড়্দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে,
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগান্তরে ॥

(৫৯)

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥

ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন,
দুরন্ত শমন বাঁধনে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥
দুর্গা দুর্গা মন বল একবার।
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার,
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখনা ॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখ না মা কালান্ত নিকটে গেল।
প্রসাদ বলে বল কালী কালী বল,
দূর হবে কাল যম-যন্ত্রণা ॥

(৬০)

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি
ও মা তুমিও কোন্দল করেছ।
বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পাবে,
যাননি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি।

ওমা, কোথায় লুকাবে বল—
তোমার/কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা,
এত কেন হলে ভারী।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ সারি ॥

---

(৬১)

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজী,
এবার এ বাজী তোর গো ॥
ওমা, দিতিস নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চায কি
কি জোরে করিবে জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি সার।
শুধু সোর করা সারা।
ভোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো
ওমা, ঘোরে মহানিশা,
মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।

আমার একুল ওকুল দু'কুল গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এমা আমি টানি কুলে, মন প্রতিকুলে
দারুণ করম ভোরে
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে দুটানায়
মরে মন ভুঁড়ো চোর গো ॥

## (৬২)

ওরে নূতন নেয়ে।
ভাঙা নৌকা চল বেয়ে ॥
দু'কূল রইল দূর ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে যে দেয়া,
মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুননিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ্।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছে তবে হইবে হে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণরক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল।
কহিছে প্রসাদ দাস রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥

(৬৩)

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো
এসে ছিলাম ভবের হাটে
হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে নায়ে লব গো ॥
দেশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা, তার ঠাঁই যে চায়, সে কোথায় পাবে গো,
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দেনা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে
ভবানীরে গো ॥

(৬৪)

তারা! তোমার আর কি মনে আছে
মা, এখন যেন রাখলে সুখে,
তেমনি সুখ কি আছে ॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমার সাধ্যি,
মাগো ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে ॥
আর যাই থাকিত ঠাঁই,
তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো, ওমা দিয়ে আশা কাটলে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে ॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা,
দক্ষিণা হয়েছে ॥

---

## স্বরলিপি

### বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়

গ প ম গ স রে া ¦ গ া প ¦ ম প া ||
ব ল মা আ মি - দাঁ ড়া ই কো থা -

প ধা া | ধ র্স র্স া | নি ধ প নি া নি |
আ মা র কে হ নাই শ ঙ্ক রি হে থা -

প ধ ধ | র্স র্স া | নি ধ প | নি া নি |
মার সোহাগে বা পে র আদর এ - দৃ

র্স র্রে া স র্স া | নি র্স া ¦ া া া
ষ্টা ন্ত - য থা -ত থা - - - -

র্রে র্গ র্ম র্গ র্রে র্রে র্স নি | নি া নি | স র্রে া ||
মার সোহাগ বা পের আদর এ - দৃ ষ্টা ন্ত -

র্স নি র্স | প ধ র্স র্স | নি র্স নি ¦ ধ ধ নি ||
যথা ত থা যে বাপ বিমাতা কে শি রেধ রে এ ম

র্স রে র্স | র্স নি া | ধ ও ধ | ম প া ||
- ন - বা পে র ভরসা বৃ থা -

প্ ধ্ স | রে গ া | ক প া ¦ রে গ রে |
তু মি না ক রি লে কৃ পা - যা ব কি

সে রে নি | স গ ম | প প প | ম া ন |
বি মাতা য থা য দি বি মাতা আমায় ক রে ন

ম গা । রেগরে রে । রে গরে । সা া া ॥
কোলে - দেখা নাই আর হে থা সে থা - -

প ধ য র্স র্স া । নিধপ । নি নি র্স
প্রসাদ বলে ওই ক - থা - - বে দা গ

র্রে র্স র্স । া র্স র্স । া া া । া া া ।
মনে আ ছে - গাঁ থা - - - - - -

র্রে র্গ র্ম র্গ । র্রে র্রে র্রে । র্স নি নি । র্স রে া ।
প্র সাদ বলে ও ই ক থা - বে দা গ মে

র্স নি র্স । প ধ র্স র্স । র্স র্স নি র্স । নি ধ া
আছে গাঁ থা ওমা য়ে জন তোমার নাম করে ত-র -

ধ নির্স র্রে । র্স নি ধ । পা ধ । ম পা া ॥
হাড় মা - লা লা আর ঝু লি - ব্র থা - -

### কাজ কি মা সামান্য ধনে

গা া প । ম গা া । র রে গম । ম পা া ।
কা - জ কি মা - সা মা ন্য ধ নে -

(পপ) প ধ নি । র্স র্রে র্স । নি ধ প ধ ম প ॥
ও কে কাঁ দ ছে - - কে তো র ধন বি হ নে

প ধ ধ | ধ র্স র্স | নি ধ নি | সঃ লি ধ প |
সা মা ন্য ধন দিলে তা রা - - - -

নি র্স র্রে | র্স র্স া | নি স া | া া া া |
পড়ে র বে ঘ রে র কোণে - - - -

রে র্গ র্ম | র্গ রে র্রে | রে র্স নি | নি নি র্স |
সা মা ন্য ধন দি লে তা রা - প ড়ে র

র্রে র্স স | া নি র্স | প ধ ধ | র্স র্স স ||
বে ঘ রে র কোণে যদি দে প আ মায়

র্স র্স নিধ | ধ নি র্স র্রে | র্স নি ধ প | ধ ম প ||
অভয় চরণ রা খি - হৃ দি পদ্মা স নে -

প ধ ধ | ধ র্স র্স | নি ধ নি , র্স নিধপ |
গু রু আ মায় কৃ পা ক রে - মা - -

নি নি স রে | র্স র্স া | নি র্স া | া া া |
যে ধন দিলেন কা নে - কা নে - - - -

শ ধ ধ | র্স া র্স | া স নি | ধ ধ নি
এ মন গুরু আরা -ধিত - ম ন্ত্র তা ও হা

স র্রে স | দ্বি ব প | া ধ ম | প া া ||
- - রা লা ম সাধ - ন বি নে - -

প ধ ধ | স র্সা | নিধনি | র্সনিধপ |
প্রসা দ বলে কৃপা য দি মা - - - -

নি র্স র্রে | র্স র্সা | নির্সা | া া া
হবে তোমার নিজ - - গু ণে - - - -

র্রে র্গ র্ম | র্গ র্রে র্রে | র্রে র্স নি | নি নি র্স |
প্রসাদ ব লে কৃ পা যদি মা - হ বে তো

র্রে র্স র্স | নি র্সা | প ধ ধ | র্স র্স স
মা র নিজ গু ণে - আ মি অন্তিম কালে জয় দুর্গা

র্স র্স নি ধ | ধ নি স র্রে | র্স নি ধ প | ধ ম প ॥
বলে স্থান পা - ই যে ন চ র ণে ।